জঙ্গিবাদ সঙ্কট

সমাধানের উপায়



হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল

জঙ্গিবাদ

উত্তরণের একমাত্র পথ

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এমাম, হেযবুত তওহীদ

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল

জঙ্গিবাদ- উত্তরণের একমাত্র পথ

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এমাম, হেযবুত তওহীদ

অনুলিখন: মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান

প্রকাশনা ও পরিবেশনা

তওহীদ প্রকাশন

(বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একমাত্র পরিবেশক)

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১

www.ataglance.hezbuttawheed.com

www.hezbuttawheed.com

www.hizbuttawheed.com

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯১২-৩১-৭

প্রচ্ছদ: মনিরুল এসলাম চৌধুরী

প্রকাশকাল : ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী

ভূমিকা

জঙ্গিবাদ ও ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে প্রয়োজন সম্মিলিত জেহাদ

জঙ্গিবাদ বর্তমানে মানবজাতির সর্বপ্রধান সমস্যা। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে পৃথিবীর পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো। সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি পশ্চিমা ভাবধারার গণমাধ্যমগুলো জঙ্গিদের বিরুদ্ধে জনসমর্থন সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। তারা যেভাবে এ প্রচারণা চালাচ্ছে, তাতে কেবল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নয় খোদ এসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণার বোধ জন্ম নিচ্ছে। এ লড়াই যতটা না সামরিক তারচেয়ে বহুগুণ বেশি সভ্যতার সংঘাত (Clash of civilizations), এসলাম বনাম পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা। যেহেতু গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাই এ যুদ্ধে তারা এসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে পুরোপুরি সফল হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপের বহুদেশে মোসলেম (দাবিদার) মেয়েদের হেজাব ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, চীনে দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বময় এসলামের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মূল্যবোধ, সংস্কৃতি বা পরিচয়জ্ঞাপক বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, মোসলেম দেখলেই তার গায়ে থু থু দিচ্ছে, কোর'আন পোড়াচ্ছে, মসজিদ মানেই জঙ্গি আস্তানা মনে করা হচ্ছে, মিনার ভেঙ্গে ফেলার আন্দোলন হচ্ছে, কারো নামে মুসলমানিত্বের চিহ্ন থাকলে তাকে যতদূর সম্ভব হয়রানি করা হচ্ছে। এভাবে জঙ্গিবাদের ফলাফল ভোগ করতে হচ্ছে ১৬০ কোটি মোসলেমকেই। তাই জঙ্গিবাদকে এখন আর কেবল রাজনীতিক বিষয় ভেবে দূরে সরিয়ে রাখলে চলছে না, সর্বশ্রেণির মানুষকেই জঙ্গিবাদের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যেমন:

১. কারা, কী উদ্দেশ্যে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছে?

২. জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে কীভাবে 'আলেমদের' ব্যবহার করা হয়েছে?

৩. জঙ্গিবাদের ফসল উঠছে কার ঘরে, আর কে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত?

৪. এসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ কেন অবৈধ?

৫. জঙ্গিবাদ নির্মূলের সঠিক পন্থা কী?

জঙ্গিরা ভিনগ্রহের প্রাণী নয়, এক সময় তারা আমাদের সমাজেরই অংশ ছিলেন। কিন্তু জীবনের একটি পর্যায়ে এসে তারা জঙ্গিবাদ (যা একটি ভ্রান্ত মতবাদ) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছেন। কোথাও কোথাও জঙ্গি হওয়ার অন্য কারণও থাকে যেমন নির্যাতিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য বা স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য লড়াই চালাতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ জঙ্গিবাদের আশ্রয় নিয়েছে। কারণ যা-ই হোক না কেন, জঙ্গিরা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে 'জেহাদ' বলেই বিশ্বাস করেন এবং অন্যদেরকেও কথিত 'জেহাদে' যোগ

দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এসলাম প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সঠিক ধারণা না থাকায় জঙ্গিদের দ্বারা সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপথে পা বাড়ায়। ধর্মকে ব্যবহার করে এক শ্রেণির রাজনীতিকও স্বার্থ হাসিল করেন। তারা মানুষের ধর্মানুভূতিকে উত্তেজিত করে তোলে এবং সহিংস হতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে তারা প্রায়শই দেশে দাঙ্গাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। যে দেশে জঙ্গিবাদীদের সন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে সেখানেই সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালিয়ে দেশ দখল করার সুযোগ খোঁজে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্দেশ্যে জঙ্গিবাদ ইস্যুটির জন্ম দিয়ে তা বিশ্বময় রপ্তানি করেছে এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো পররাজ্য দখল করা, পরসম্পদ লুট করা আর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ‘এসলাম’-কে ধ্বংস করে দেওয়া। এর স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যটি নিয়ে আলোচনার তেমন প্রয়োজন নেই, এ বিষয়ে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমানের একটি উক্তিই যথেষ্ট হবে আশা করি। তিনি ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, “তথাকথিত ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ সূচনা করে মোসলেম বিশ্বকে পদানত রাখার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে। দেশটি আফগানিস্তানে যুদ্ধের সূচনা করে, তা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে।” এ যুদ্ধে পক্ষে-বিপক্ষে মোসলেম দাবিদারদেরকেই ব্যবহার করা হচ্ছে অবিশ্বাস্য কূটকৌশলে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এ এক ভয়াবহ নীতি। তারা একদিকে জঙ্গিদেরকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের এ কর্মপন্থা দেখে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে, আসলে তারা জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটন চায়, নাকি এটা তাদের রাজনীতির খেলামাত্র (Political game)? আমাদের দেশের অর্থনীতিকে যেমন বলা হয় কৃষি অর্থনীতি, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ অর্থনীতি (War Economy), অস্ত্র ব্যবসা তাদের আসল ব্যবসা। যুদ্ধ না থাকলে তারা সঙ্কটে পড়বে, তাদের প্রয়োজন বিশ্বজোড়া অস্ত্রের বাজার। তারা চায় যুদ্ধ জিইয়ে রাখতে, কিন্তু তাদের সৈন্যরা যুদ্ধবিমুখ ও ভোগবাদী। তাই দরকার পড়েছে মোসলেমদের একটি দলকে আরেকটি দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া। জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে একটার পর একটা দেশ এভাবেই তারা দখল করে নিয়ে পা চাটা পুতুল সরকার বসাচ্ছে। সুতরাং জঙ্গিরা পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে অতি প্রয়োজনীয় শত্রু (Useful enemy)। অনেক দেশের সরকারও জঙ্গিবাদ নির্মূল হোক এটা চায় না, জঙ্গিরা থাকলে তাদের বহুমুখী স্বার্থোদ্ধারের পথ খোলা থাকে। কিন্তু সত্যিকারভাবে যারা মানুষের কল্যাণকামী এবং যারা এসলামপ্রিয় তাদেরকে বুঝতে হবে যে, এ জঙ্গিবাদ পাশ্চাত্যের গর্ভে জন্ম নেওয়া এসলামের শত্রু। জঙ্গিবাদের অজুহাত দিয়ে যে পরিমাণ মোসলেম হত্যা করা হয়েছে এবং এসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম বলে পরিচিত করা সম্ভব হয়েছে আর কোনো উপায়ে সেটা সম্ভব হয় নি। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা উপরে উপরে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও জঙ্গিবাদকে তারা নিজেদের স্বার্থেই ধ্বংস হতে দেবে

না, জঙ্গিবাদ না থাকলে অস্ত্র ব্যবসাই তো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যারা প্রকৃতই মানুষ, যাদের মধ্যে মানুষের ধর্ম মানবতাবোধ কাজ করে তাদের উচিত জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। নয়তো এই ইস্যুকে ব্যবহার করে আরো লক্ষ লক্ষ মানুষকে হতাহত ও বাস্তুহারা করবে পশ্চিমা 'সভ্য' দেশগুলো।

জঙ্গিবাদ নিয়ে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে, হাজার হাজার পত্রিকা এ নিয়ে লক্ষ লক্ষ লাইন লিখেছে। তারা জঙ্গিবাদের ইতিবৃত্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের অনেকের গবেষণা থেকে তথ্যগত সাহায্য নিয়েছি; বিশেষ সাহায্য পেয়েছি অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেনের লেখা থেকে। "পশ্চিমা বিশ্ব জঙ্গিবাদের স্রষ্টা"- এ সত্য কথাটি বলার জন্য যে সাহসী হৃদয় দরকার সেটি তার আছে। তিনি একটির পর একটি বই লিখে অমূল্য তথ্য-প্রমাণ দিয়ে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। তার প্রতি বিনীত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। জঙ্গিবাদ যে একটি বড় সমস্যা এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এর সুষ্ঠু কোনো সমাধান বাতলাতে পারেন নি। কিন্তু আমাদের এ ছোট্ট বইয়ের সঙ্গে পৃথিবীর সকল বইয়ের পার্থক্য হলো, এ বইতে আমরা জঙ্গিবাদ নির্মূল করার সঠিক উপায়, যে উপায় স্বয়ং আল্লাহ দান করেছেন, সেটা তুলে ধরেছি। বিশ্বে এখনো শক্তি প্রয়োগ করাকেই এ সমস্যার সমাধান হিসাবে ভাবা হচ্ছে, যদিও আজ পর্যন্ত এ পথে কেউ সফল হয় নি, বরং জঙ্গিবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইদানীং বিদগ্ধজনেরা জঙ্গিবাদকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। আমাদেরও বক্তব্য সেটাই। যেহেতু জঙ্গিরা এসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত (Motivated), তাই এসলামিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারাই তাদের আদর্শকে ভ্রান্ত প্রমাণ না করা গেলে তারা ফিরবে না, দিন দিন আরো নতুন জঙ্গি জন্ম দিতে থাকবে। এমনই অকাট্য দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির সন্ধান দিতে পারে এ বইটি। ধর্মের নামে চালিয়ে যাওয়া অধর্ম জঙ্গিবাদে বিরুদ্ধে এ বই হতে পারে একটি অমোঘ হাতিয়ার।

আশা করি সরকার, সাধারণ জনগণ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই জঙ্গিবাদ ও ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতির সমাধানকল্পে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টি নিয়ে ভাববেন।

আমাদের প্রকাশনাসমূহ

১. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

২. এসলামের প্রকৃত সালাহ্ - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৩. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’! - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৪. Dajjal? The Judeo-Christian ‘Civilization’! (অনুবাদ)

৫. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৬. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৭. আল্লাহর মো’জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৮. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

৯. যুগসন্ধিক্ষণে আমরা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

১০. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ) - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলি

১২. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ

১৩. এসলাম শুধু নাম থাকবে (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)

১৪. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান (প্রচারপত্র সঙ্কলন)

১৫. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)

১৬. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই

১৭. সন্মার্গ

১৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (সংক্ষিপ্ত)

১৯. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা

২০. Divide and Rule (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)

২১. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব

২২. দান: এসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি- এম.আমিনুল এসলাম

২৩. একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ (প্রামাণ্য চিত্র)

২৪. ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতির ইতিবৃত্ত (প্রামাণ্যচিত্র)

২৫. নারীর মর্যাদা (প্রামাণ্যচিত্র)

২৬. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'! (প্রামাণ্যচিত্র)

২৭. দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (প্রামাণ্য চিত্র)

২৮. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা- মো'জেজার ভাষণের সিডি

২৯. অন্যান্য দল না করে হেযবুত তওহীদ কেন করব? (আলোচনার ভিসিডি)

৩০. ঞযব খবধফবৎ ড়ভ ঃযব ঞরসব (গানের অ্যালবাম-সিডি)

৩১. সনাতন ধর্ম (প্রামাণ্যচিত্র)

৩২. সনাতন (প্রকাশিতব্য)

৩৩. ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

৩৪. The Lost Eslam (প্রকাশিতব্য)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আজ সারা পৃথিবীতে একটি ঘৃণিত, প্রত্যাখাত ও আতঙ্কের বিষয় হলো জঙ্গিবাদ। কারো বংশের মধ্যে কোনো কারণে কারো নামের সাথে একবার যদি 'জঙ্গি' শব্দটা যুক্ত হয়, তাহলে সেই বংশের লোকের আর নিস্তার নেই। এই জঙ্গি শব্দটা কীভাবে আসলো, কীভাবে মোসলেম জনগোষ্ঠীর গায়ে 'জঙ্গি' তকমাটা লেগে গেল, এটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করার সময় এসেছে। এ আলোচনা এখন প্রাসঙ্গিক এজন্য যে, জঙ্গিবাদকে অসিলা হিসাবে ব্যবহার করে একের পর এক সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোকে পাশ্চাত্যের পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজেদের পেটের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। তাদের আগ্রাসনে, বোমাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে শহর, নগর, বন্দর। একই উপায়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতেও যে ভয়াবহ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না, এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না; বিশেষ করে যখন প্রায়শই ধর্মীয় ইস্যুতে বা রাজনীতিতে ধর্মের অপপ্রয়োগের পরিণামে আমাদের দেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ড তথা জ্বালাও-পোড়াও, বোমা হামলা, মানুষ হত্যা, জাতীয়সম্পদ ধ্বংস, রাস্তাঘাট বিনষ্টিকরণ, বৃক্ষকর্তন সব মিলিয়ে দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। এই লেখাটিতে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এই ভয়াবহ সংকটের উৎপত্তি কোত্থেকে এবং কীভাবে এর সমাধান করা যায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুটি বৃহৎ জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড

বর্তমান সময়টাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে বিগত শতাব্দীতে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সূত্রপাত যদিও হয় বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রানৎস [Franz Ferdinand (18 December 1863 – 28 June ১৯১৪)] এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু এই ঘটনাটি বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ছিল না। অস্ট্রিয়া এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে দু'দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ছিল উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের কারণে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্য বিক্রির জন্য উপনিবেশ স্থাপনে প্রতিযোগিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একপক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া, জার্মানি, তুরস্ক, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, যাদের বলা হতো কেন্দ্রীয় শক্তি। আর অপরপক্ষে ছিল প্রধানত সার্বিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। যাদের বলা হতো মিত্রশক্তি। এই বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্গত মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডগুলো থেকে সংগৃহীত প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) মোসলেম বংশোদ্ভূত সৈন্য ব্রিটিশের পক্ষে

যুদ্ধ করেছে (The Guardian, Saturday 2 August 2014)। তখন কিন্তু এই মোসলেমদেরকে জঙ্গি বলা হয় নি।

জঙ্গি শব্দটি এসেছে ফার্সি শব্দ 'জঙ্গ' থেকে। 'জঙ্গ' অর্থ যুদ্ধ আর জঙ্গি মানে যোদ্ধা। সুতরাং যারা যুদ্ধ করে তারাই 'জঙ্গি'। শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় নিলে 'আধুনিক যুগে' সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ জঙ্গিবাদী কার্যক্রম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এতগুলো দেশ ধ্বংস হলো, পাঁচ কোটির অধিক প্রাণ হারাল, প্রায় তের কোটি মানুষ পঙ্গু-বিকলাঙ্গ হলো, শত শত নগর-বন্দর ধ্বংস হলো। দ্বিতীয় বৃহত্তম জঙ্গিবাদী কার্যক্রম হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভয়াবহ পারমাণবিক বোমা বর্ষণের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটলেও এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুফল আজও পৃথিবী বয়ে বেড়াচ্ছে। আজও জাপানে বিকৃত, প্রতিবন্ধী, পঙ্গু শিশুর জন্ম হচ্ছে, আজও সেই তেজস্ক্রিয়তা মানুষের শরীরে মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে চলেছে- যা মানবজাতিকে প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, পৃথিবীর মালিকানা কোন দানবিক শক্তির হাতে। অতীতে মানবজীবনে এতবড় পৈশাচিক ঘটনা, এতবড় অভিশপ্ত ঘটনা আর ঘটে নি। কিন্তু এতবড় অন্যায়কে জঙ্গিবাদী বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসাবে কেউ নিচ্ছে না। ঐ ধ্বংসযজ্ঞের উদ্দেশ্যই ছিল মানবজাতির হৃদয়ে আমেরিকার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পর্কে ত্রাসের সঞ্চার করা যা তারা সফলভাবে করতে পেরেছে এবং যে ত্রাস আজও অটুট আছে। ঐ জঙ্গি কার্যক্রমে সরাসরি জড়িয়েছে ৬১টি দেশ কিন্তু যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে ১০৪টি দেশ। মোট নিহতের সংখ্যা সাড়ে আট কোটি, স্বভাবতই আহতের সংখ্যা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের পক্ষে যুদ্ধ করে খেলাফতের দাবিদার তুরস্ককেন্দ্রিক অটোমান সাম্রাজ্য। তুর্কীরা 'খেলাফত' শব্দটি ব্যবহার করলেও এটা প্রকৃত এসলামের খেলাফত ছিল না। আর দশটা সাম্রাজ্যের মতো এটিও ছিল একটি সাম্রাজ্যমাত্র। একইভাবে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণিটি কেবল ক্রুশ ধারণকারী খ্রিষ্টান, যিশুখ্রিস্টের আদর্শ ধারণকারী নয়। তারা রাজনীতিক স্বার্থে ঈসার (আ.) নামকে বিক্রি করে চলছে, কারণ ইউরোপের অধিকাংশ জনগণ খ্রিষ্টান। এটি মহাসত্য যে প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপিয়ানদের ঈসার (আ.) অনুসারী হওয়ার কোনো ধর্মীয় বৈধতা নেই, কেননা তিনি এসেছিলেন শুধু বনি ইসরাইলের নবী হিসাবে, তাই ইহুদি গোত্রের বাইরে ধর্মপ্রচারের কোনো অধিকার তাঁর ছিল না, তিনি তা করেনও নি। তিনি তাঁর জাতিকে বলেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি শুধু বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষগুলোকে উদ্ধার করতে (ম্যাথু ১৫: ২৪)। তাঁর প্রধান বারো জন শিষ্যকে তিনি যখন প্রচারকার্যে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন তখন তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন- "তোমরা অন্য জাতিগুলোর মধ্যে যেওনা এবং কোনো সামারিয়ান শহর নগরে প্রবেশ কর না। শুধু মাত্র ইসরাইলি বংশের পথভ্রষ্ট মেষগুলোর কাছে যেতে থাকবে (ম্যাথু ১০:৬)।

তবু একটা সময়ে এসে যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতির কারণেই হোক ঈসার (আ.) অনুসারী দাবিদাররা ইহুদিদের বাইরে ঈসার (আ.) শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন এবং ফলস্বরূপ রোমান সম্রাট

কনস্ট্যানটাইন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য রাজ্যের রাজন্যবর্গও এই ধর্মমতটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে নেন। তাদের হুকুমে এবং নির্যাতনের ভয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য জনগণের সিংহভাগ তাদের রাজার ধর্ম মেনে নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য খ্রিষ্টধর্মকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন এমন লোকও নিশ্চয়ই অনেক ছিল। ধর্মীয় বৈধতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও যুক্তির খাতিরে ধরে নিচ্ছি, একজন আল্লাহ প্রেরিত মহামানবের শিক্ষা মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে এটাই স্বাভাবিক, তাই কোনো জাতিগোষ্ঠী যদি ঈসার (আ.) প্রকৃত শিক্ষাকে ধারণ করে সেটা অবশ্যই তাদের জীবনকে উন্নত করবে। তাই ইউরোপিয়ানরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাদের অনেকেই ঈসার (আ.) শিক্ষা থেকে সৎ, চরিত্রবান, উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনে সক্ষম হয়েছেন। তবে শাসকদের এই খ্রিষ্টধর্ম ধারণের কারণ কোনোকালেই ধর্মীয় নয়, রাজনীতিক। শাসকশ্রেণি যদি ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী হতো তাহলে কখনোই তারা ধর্মনিরপেক্ষতা নাম দিয়ে এক ভয়ঙ্কর বস্তুবাদী আত্মাহীন মতবাদ মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দিতে পারত না। ব্রিটিশ সম্রাট অষ্টম হেনরি ১৫৩৭ সনে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে বহিঃষ্কার করেন যার পরিণামে জন্ম নেয় পাশ্চাত্য বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জাল (Anti Christ)। এই খ্রিষ্টান নামধারী শাসকরা যদি ঈসার (আ.) প্রকৃত অনুসারী হতেন তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিতই হতো না।

ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশগুলোতে কীভাবে ধর্মকে, যিশুর বাণীকে রাজনীতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে সেটা ইতিহাস। নোবেলজয়ী আফ্রিকান বিপ্লবী ডেসমন্ড টুটুর একটি উক্তিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। তিনি বলেছিলেন, 'When the missionaries came to Africa they had the bible and we had the land. They said 'let us pray.' We closed our eyes. When we opened them we had the bible and they had the land.'

অর্থাৎ-"যখন মিশনারিরা আফ্রিকায় এলেন তাদের কাছে ছিল বাইবেল এবং আমাদের কাছে ছিল স্বদেশ। তারা বললেন, 'এসো আমরা প্রার্থনা করি।' আমরা চোখ বন্ধ করলাম। যখন চোখ মেললাম, দেখি আমাদের হাতে আছে বাইবেল আর তাদের দখলে আমাদের স্বদেশ।"

ভুললে চলবে না যে ডেসমন্ড নিজেও কেবল একজন খ্রিষ্টানই নন, তিনি কেপটাউনের প্রধান ধর্মযাজক। তাই খ্রিষ্টবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য তিনি সহজেই উপলব্ধি করেছেন। আফ্রিকার মতো আমাদের উপমহাদেশেও ব্রিটিশরা খ্রিষ্টধর্মের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এসলাম ধর্মকেও তাদের রাজনীতিক ফায়দা হাসিলের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে।

একইভাবে তুর্কি অটোমানরাও প্রকৃত মোসলেম ছিল না। রসুলাল্লাহর এন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পরেই প্রকৃত এসলামের উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে। প্রকৃত এসলামের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপ্রতিষ্ঠা আর রসুলাল্লাহর এন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পরে এর উদ্দেশ্য পাল্টে হয়ে গিয়েছিল রাজ্যবিস্তার। স্রষ্টার প্রেরিত সকল ধর্মের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে মানবতার কল্যাণ। যে ধর্মের উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ নয়, সেটা

আল্লাহর ধর্মই না। আর যে ধর্মটি শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার, আমীর-সুলতান ও তথাকথিত খলিফাদের ভোগবিলাসের রসদ যোগায় সেটা প্রকৃত এসলাম হতে পারে না, তবু বেশভূষা দেখে বিশ্ববাসী সেটাকে এসলাম বলেই মনে করতে থাকল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের পরাজয়ের পর তাদের মিত্রশক্তি তুর্কি খেলাফত আর অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারলো না। বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর নানান কূটকৌশলের পরিণতিতে তুর্কি সাম্রাজ্যের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এসলাম-বিদ্বেষী পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণকারী একটি শ্রেণি। এরাই দেশটিকে স্বাধীনতা ও আধুনিকতার ছদ্মাবরণে পাশ্চাত্যের বুটের নিচে ঠেলে দিল। তুর্কি সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল, খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্যও। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বিশ্বের বুকে ক্যানসাররূপে জন্ম নিল ইহুদি জাতীয়তাভিত্তিক ইসরাইল রাষ্ট্রটি, আর হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলে বিশ্বমানবের হৃদয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে প্রধানতম পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একই পক্ষে থেকে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু যুদ্ধের শেষে তারা নিজেরাই হয়ে দাঁড়াল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা ঘোরশত্রু। কারণ উভয়ের হাতেই আছে পারমাণবিক অস্ত্র আর এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারল না কেবল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই, যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় দাতাঁত (Deterrent)। তারা শুরু করল কূটনৈতিক দাবাখেলা, যার নাম দেওয়া হলো ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold war)। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে যদি ব্যর্থ প্রমাণ করা যায় তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকবে না এটাই ছিল পুঁজিবাদী মার্কিনি ও তার দোসরদের মূল কর্মপন্থা। এটা করতেও তেমন বেগ পেতে হলো না, কারণ প্রাকৃতিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রবল বিদ্রোহ সৃষ্টি হলো সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করল সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারণায়। নব্বইয়ের দশকে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ষড়যন্ত্রের রঙ্গমঞ্চ আফগানিস্তানে ধর্মের অপব্যবহার

ঠাণ্ডা যুদ্ধ কিন্তু সব জায়গায় ঠাণ্ডা থাকে নি, কোথাও কোথাও তা শ্যুটিং ওয়ারেও রূপ নিয়েছে- যেমন আফগানিস্তান। কম্যুনিস্ট মতবাদকে ভূলুণ্ঠিত করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত শাসনাধীন এলাকার মোসলেমদের ধর্মীয় অনুভূতি ও স্বাধীনতার চেতনাকে কম্যুনিস্ট নাস্তিক্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। আফগানিস্তানে এক দশক দীর্ঘস্থায়ী যে যুদ্ধ (১৯৭৯-১৯৮৯) হয় সেটা ছিল কোল্ড ওয়ারেরই অন্তর্ভুক্ত। এটি বাহ্যত ছিল আক্রমণকারী রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট-বিরোধী গেরিলাদের যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামী জনগণের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে।

ভৌগোলিক স্বাধীনতা বা ভূখণ্ডরক্ষার যুদ্ধগুলোতে অধিকাংশ জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য ঐ জাতির মধ্যে বিরাজিত বিভিন্ন চেতনাকে কাজে লাগানো হয়। যেমন কেউ কেউ বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগিয়েছেন, যেমন: নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ। কেউ কেউ ভাষাকে কাজে লাগিয়েছেন, কেউ কাজে লাগিয়েছেন ধর্মকে। কিন্তু আদতে এ সবই ছিল জাতীয় অধিকার আদায় বা স্বাধীনতার আন্দোলন, কেবল যেখানে যে ফ্যাক্টরটা বেশি ফলপ্রদ সেখানে সেটাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধিকার আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছাড়াও হিন্দু, মোসলেম, শিখ জাতীয়তাবাদী সহিংস/অহিংস দল অনেক ছিল। ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয় জাতিগুলোকে মোসলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্য খ্রিষ্টধর্মকে ব্যবহার করেছিল রাজ্যগুলোর রাজন্যবর্গ ও ধর্মব্যবসায়ীরা। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগানদেরকে এই অসম যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্যও যুক্তরাষ্ট্র ধর্মকে ব্যবহার করেছে।

কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক মোসলেম রাষ্ট্র এবং আমেরিকার যৌথ প্রযোজনায় আফগানিস্তানের পার্বত্যভূমিতে যে রক্তাক্ত নাটক মঞ্চায়িত হয়েছিল তার কুশীলব ছিল কেবল আফগান মোজাহেদিনরা। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না কারণ এ বইয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন। যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান তারা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা - আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা' বইটি পড়ে দেখতে পারেন। আমরা কেবল ধারণা দেওয়ার জন্য বইটির ১২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখকৃত কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি, "(মার্কিন প্রেসিডেন্ট) কার্টারের রুশবিরোধী দল পাকিস্তান, মিশর আর সৌদি আরবের সাহায্য সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিতই ছিল। এ উপদেষ্টাদের এখন প্রয়োজন, এ যুদ্ধে তিনটি উপকরণের, অর্থ, জনবল আর অস্ত্রের নিশ্চয়তা। এগুলোর সমন্বয়েই এ যুদ্ধ পরিচালিত হবে। প্রাথমিকভাবে CIA এবং পরে ধনী মোসলেম দেশগুলোকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এরপরে রয়েছে জনবল। বেশিরভাগ যোদ্ধা আফগান আর পাকিস্তানের সীমান্ত থেকেই আসবে, সে সাথে অন্যান্য মোসলেম দেশ এবং বিভিন্ন স্থানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগ্রহ করে এ যুদ্ধের জনবল যোগাড় হবে। এ যুদ্ধের জন্যে রাশিয়ার তৈরি অস্ত্র যোগাড় করে পরে এ ধরনের অস্ত্র তৈরি করবার উপযুক্ত দেশ খুঁজতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানের আফগানিস্তান সংলগ্ন স্থানগুলো উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাই সাব্যস্ত হলো এর দায়িত্ব CIA-র তত্ত্বাবধানে ISI এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে। মোটামুটি এই ছিল সোভিয়েতবিরোধী জেহাদের পরিকল্পনার মোটা দাগগুলো।"

আফগানরা প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী এসলাম ধর্মের অনুসারী, তারা অন্যান্যদের মতো নামকাওয়াস্তে মোসলেম না, তাদের ধর্মচেতনা গভীর এবং তারা জাতিগতভাবেও কঠোর পরিশ্রমী ও সাহসী। পৃথিবীর সমস্ত মোসলেম দেশগুলোর মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতেও আফগানিস্তান ধর্মীয় অনুভূতির দিক দিয়ে সর্বাগ্রে। এসলামের অবমাননা করে কেউ কিছু করলে সবচেয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় আফগানিদের মধ্যে। এই চেতনা এখন অনেকটা হ্রাস পেয়ে গেলেও আফগান-রাশিয়া যুদ্ধের সময়

তা বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। সেই যুদ্ধে একদিকে তদানীন্তন সুপারপাওয়ার রাশিয়ার সাথে তাদের প্রশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ সেনা, কমান্ডো, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্যাংক, জঙ্গি বিমান ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে একটি দরিদ্র দেশের "অশিক্ষিত" জনগণ- যারা কিনা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, কৃষক-শ্রমিক, দিনমজুর, রাখাল। সাথে তাদের সামান্য কিছু ভাঙ্গা বন্দুক, কাটা রাইফেল, পাহাড়ের গুহার কামারখানার তৈরি ছুরি-চাকু-পিস্তল আর আছে গরুমারার লাঠি। যুদ্ধে আনুমানিক ১৫ লক্ষ আফগান প্রাণ হারিয়েছে যার সিংহভাগই ছিল বেসামরিক জনতা [Noor Ahmad Khalidi, "Afghanistan: Demographic Consequences of War: 1978-87," Central Asian Survey, vol. 10, no. 3, pp. 101–126, 1991]। রুশ বিমানগুলো নির্বিচারে আফগানিস্তানের গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য করে দিয়েছে, বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ করেছে সাধারণ মানুষের ওপর। কেবল স্থল মাইন পেতে দুই লক্ষের উপর মানুষ হত্যা করেছে, চার লক্ষকে করেছে পঙ্গু, অচল। পরবর্তী প্রজন্মকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে দেওয়ার জন্য খেলনা বোমা ফেলে রেখেছে দেশের সর্বত্র, যেন শিশুরা আকৃষ্ট হয়ে সেগুলোতে হাত দেয় এবং বিস্ফোরণের শিকার হয়। রাশিয়া প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করে দীর্ঘ ১০ বছর যুদ্ধ পরিচালনা করে। এতে করে রাশিয়ার আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়, রুবলের মান বাংলাদেশের টাকার চেয়ে অনেক নিচে নেমে যায়। এ নিয়ে কৌতুকও চালু হয়েছিল- যেমন: কেউ যদি প্রশ্ন করে, রুবল, ডলার ও পাউন্ডের পারস্পরিক বিনিময় হার কত? এর উত্তর হবে, এক পাউন্ড রুবল = এক ডলার।

বিভিন্ন মোসলেম দেশ থেকে লাখ লাখ যুবক আফগানিস্তানে ছুটে গিয়েছিল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য। তারা কি বুঝেছিলেন যে, এটা জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ নয়, এটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে আল্লাহ-রসুলের কিছু আসে যায় না? বুঝতে পারেন নি, কারণ এই যুবকদেরকে প্রাণদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মোসলেম দেশগুলোতে হাজার হাজার ধর্মব্যবসায়ীকে ভাড়া করছিল যারা তাদের যার যার দেশের যুবকদেরকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উত্তেজিত ও সংঘটিত করেছিল। তারা বলত যে এটা যুদ্ধ নয়, জেহাদ ও কেতাল ফি-সাবিলিল্লাহ। আমাদের দেশেরও একজন বিখ্যাত মোফাসসের তার শত শত ওয়াজে কম্যুনিজম ও কম্যুনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়েছেন, যুবকদের মনে জেহাদি প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। যদিও মার্কিনি পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তখন তিনি কী কী তৎপরতা দেখিয়েছেন সেটা আমাদের জানা নেই।

প্রাগুক্ত গ্রন্থে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন,

"আফগান জেহাদে যোগদানকারী আরবদের মধ্যে মিশরের জেহাদিদের সংখ্যায় ছিল বেশি। এর কারণ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এসলামের পুনঃজাগরণের প্রচেষ্টার সাথে মিশরের উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত গোপন সংস্থাগুলো তৎপর রয়েছে বেশি। তদুপরি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপীঠে সমগ্র

মোসলেম জনগোষ্ঠী থেকে ছাত্ররা একত্রিত হয় উচ্চ শিক্ষার জন্যে। এখানে পরিচিত হয় এসলাম প্রবর্তনের তথাকথিত অগ্রগামী ধর্মীয় গুরুদের সাথে।”

জঙ্গিবাদের স্রষ্টা যে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ প্রভৃতি বিশ্বমোড়ল এ বিষয়টি এখন এতই সুস্পষ্ট যে বিষয়টিকে ওপেন সিক্রেট বললেও বেশি বলা হয়। আফগানিস্তানে বিভিন্ন মোসলেম দেশ থেকে যে মোজাহেদরা এসেছিলেন তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওসামা বিন লাদেন, আব্দুল্লাহ আজ্জাম প্রমুখ যারা আজ মিডিয়ার বদৌলতে ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণিত ব্যক্তি। এমনিভাবে আজকের যত সন্ত্রাসী নেতাদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে তাদের বেশিরভাগই আফগান ছায়াযুদ্ধের (Proxy war) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রাক্তন অথবা নবীন যোদ্ধা। মার্কিনি গোয়েন্দা সংস্থা CIA এই সব স্বেচ্ছাসেবী মোজাহেদদের তালিকা সংরক্ষণ করত যে ডেটাবেইজ-এ, সেই কম্পিউটার ফাইলটির নাম ছিল “আল কায়েদা”, যার আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে ডেটাবেইজ, বেইজ বা ভিত্তি। সুতরাং আল কায়েদা কোনো বিশেষ সামরিক দলের নাম ছিল না, আফগানিস্তানে লড়াই করতে আসা সকল মোজাহেদরাই ছিল আল কায়েদা নামক তালিকাটির অন্তর্ভুক্ত। Co-operative Research History Commons. Retrieved January 9, 2007.- এর বিবরণে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে, A CIA program called “Operation Cyclone” channeled funds through Pakistan's Inter-Services Intelligence agency to the Afghan Mujahideen who were fighting the Soviet occupation. CIA and British Recruit and Train Militants Worldwide to Help Fight Afghan War.

অর্থাৎ অপারেশান সাইক্লোন নামে CIA-র একটি কর্মসূচি ছিল যা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে আফগান মোজাহেদিনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করত। CIA এবং ব্রিটিশ আফগান যুদ্ধের জন্য সারা বিশ্ব থেকে ‘মিলিট্যান্ট’ (জঙ্গি) রিক্রুট করেছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছে।

এই যে ‘প্রশিক্ষণ’, এটা দিয়েছিল কিন্তু দাড়ি টুপিধারী জবরদস্ত আলেমরা-মোল্লারাই। কিন্তু এই লোকগুলো যে CIA-র নিয়োজিত সেটা কি এই আল্লাহর জন্য আত্মোৎসর্গকৃত মোজাহেদরা বুঝতে পেরেছিলেন? পারেন নি। কী নিষ্ঠুর প্রতারণা! দুঃখে হৃদয় ভেঙ্গে যায়। যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র দিল কিন্তু একটাও প্রাণ দিল না। প্রাণ দিল বোকার হদ্দ আবেগপ্রবণ পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক, মূল্যহীন খেলনারূপী মোসলেমরা। যখন রাশিয়া ভেঙ্গে গেল, আফগান মোজাহেদরা নিজেদেরকে জয়ী ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জয়ী হলো যুক্তরাষ্ট্র। বহিরাগতরা যার যার দেশে ফিরে গেলেন। তখন তারা আফগানফেরতা মোজাহেদ, ‘জেহাদি জোশে’ উদ্দীপ্ত, এসলামের জন্য জীবনপণ সংগ্রামের বাসনা তখনও বুকের মধ্যে জাজ্বল্যমান।

কিন্তু বিড়ালের ইঁদুর নিয়ে খেলা তখনও শেষ হয় নি। এই চেতনা পশ্চিমের জন্য বড় বিপজ্জনক সেটা বুদ্ধিমান জাতিগুলো বেশ বুঝতে পেরেছিল। তারা জানে যে, ধর্মীয় চেতনা নিয়ে খেলার চেয়ে

বিপজ্জনক আর কিছু নেই। তাই মোসলেম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জেহাদের যে চেতনা তারা তৈরি করে দিয়েছে, এই চেতনাকে এবার শেষ করে দিতে হবে। অন্যথায় সেটা যে কোনো সময় ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য তারা এসলামকেই টার্গেট করল।

বন্দুকের নল ঘুরল এবার এসলামের দিকে

হার্ভার্ডের প্রফেসর হানটিংটন ১৯৯৩ সনে 'The clash of civilizations?' নামে যে প্রশ্নটি তুলে দিয়েছেন সেটা ছিল খুবই বাস্তবসম্মত। তিনি তার তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে, বিশ্বে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির পরে বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীতে রাজনীতিক অথবা আর্থনীতিক ইস্যুর উপর যুদ্ধ হবার আশঙ্কা অনেক কমে এলেও এ যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা থাকবে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে। হানটিংটনের মতবাদে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য-এশীয় মোসলেম দেশগুলো, যেগুলোকে বহু আগেই 'ক্রিসেন্ট অব ক্রাইসিস' নামকরণ করা হয়েছিল, এ দু'য়ের মধ্যেই এ সংঘাত হবে। স্মরণ থাকে যে, এসলাম আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশ' বছর পরে দু'শ' বছর প্রত্যক্ষভাবে ক্রুসেড এবং এসলাম আবির্ভাবের পর থেকেই প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে পরোক্ষভাবেই দুই সভ্যতার সংঘাত চলছে। হানটিংটনের তত্ত্ব সে ঐতিহাসিক সত্যকেই মনে করিয়ে দেয়। আরো উল্লেখ্য যে, বিগত শতকে বিশ্বজুড়েই মোসলেম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনার মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ ও সম্প্রসারণ ঘটেছে যদিও সেই ধর্মটি প্রকৃত এসলাম নয়।

হানটিংটন বলেছেন, সমাজতন্ত্রের পতনের পর একটি সভ্যতার সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী যেখানে এসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোমুখি অবস্থান। কারণ কোনো ধর্মেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা নেই। সার্বভৌমত্বসহ রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন ধর্মীয় বা অধর্মীয় মতবাদ হিসাবে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে কেবল একটি জীবনব্যবস্থা, আর তা হলো এসলাম। এর আছে উজ্জ্বলতম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সংখ্যায়ও এরা ১৬০ কোটির বিরাট জনগোষ্ঠী, শত শত বছরের বঞ্চনা ও নিষ্পেষণের স্বাভাবিক পরিণতিতে তাদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের চেতনাও বেশ দানা বেঁধে উঠেছে সম্প্রতি। সুতরাং এসলামি চেতনার ক্রমাগত উত্থানকে যে করেই হোক ঠেকাতে হবে। পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকারীরা কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলার ফন্দি করল। তারা মোসলেমপ্রধান দেশগুলোতে বিভিন্ন এসলামি রাজনীতিক দল ও ধর্মব্যবসায়ী আলেম-মোল্লাদের মাধ্যমে এই জাতিটির ধর্মীয় চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে লাগল। উদ্দেশ্য, এই চেতনাকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে এসলামকেই একটি মানবতাবিরোধী, মহা বর্বর ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হলো জঙ্গিবাদ, তারপর একটা সময়ে এসে সাজানো হলো টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নাটক। এরপর থেকেই এসলামের

এই জেহাদি চেতনার নামকরণ করা হলো- মৌলবাদ (Radicalism), কট্টরপন্থা (Extremism), উগ্রবাদ (Fanaticism), জঙ্গিবাদ (Militancy), সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) ইত্যাদি।

নিউইয়র্ক আর পেন্টাগনে হামলার পরের দিন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশ এ সন্ত্রাসের হোতা এসলামি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' শুরু করবার মতো হুমকি দিয়ে বসেন। তিনি কি জানতেন না 'ক্রুসেড' শব্দটি সমগ্র মোসলেম বিশ্বের জন্য কত বেদনাদায়ক এবং উত্তেজক শব্দ? এ শব্দটি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা মোসলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। এখানে পাঠককে নিশ্চিত হতে হবে যে, কট্টরপন্থী ইভানজিলিস্ট (Evangelist) প্রেসিডেন্ট বুশও ধর্মকে রাজনীতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। তার দেশের অধিকাংশ খ্রিষ্টান জনগণ যেন এই যুদ্ধের পক্ষে থাকে সেজন্য তিনি কৌশলে একে ক্রুসেড বলে আখ্যায়িত করেন। তাই বিশ্বনেতারা কিছুটা বাহ্য রাখঢাক রাখলেও সমগ্র বিষয়টি বৃহৎ আঙ্গিকে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। ১৯৯৩ সন থেকে চলে আসা হানটিংটনের বিতর্কিত তত্ত্বটির কথা বারবার সুধি এবং সাংবাদিক মহলে উচ্চারিত হতে থাকে, এমনকি প্রকাশ্যে না হলেও ভেতরে ভেতরে প্রতিটি মোসলেম দেশকে সভ্যতার সংঘাতের এ তত্ত্ব প্রভাবিত করে তোলে।

৯/১১ এর কয়েকদিন পর (২০ সেপ্টেম্বর) আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বিশ্বময় সম্প্রচারিত এক ভাষণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে আহ্বান জানান ওসামা বিন লাদেনকে তাদের হাতে সঁপে দেবার জন্য এবং বলেন যে, "পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোকে এ মুহূর্তে নির্ণয় করতে হবে- হয় তারা আমাদের সাথে অথবা সন্ত্রাসীদের সাথে" (Either you are with us, or you are with the terrorists)। জর্জ বুশের এ উক্তি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে, যার বিশ্লেষণ চলবে বহু সময় ধরে। তার এ উক্তি পৃথিবীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে একক বিশ্বশক্তি আমেরিকার ক্ষমতার দম্ভকে। ইতোপূর্বেই সরকারিভাবে ওসামা বিন লাদেনকে এ সন্ত্রাসী হামলার হোতা হিসাবে আখ্যায়িত করার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি তার বক্তব্যে আরো আগ বাড়িয়ে বলেন যে, 'আজ থেকে যে কোনো দেশকে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ এবং সাহায্যকারী দেশ হিসেবে সনাক্ত করা হলে সে দেশকে আমেরিকা শত্রুভাবাপন্ন দেশ বলে মনে করবে।' প্রচুর করতালির মধ্যে মি. বুশ আরো বলেন, 'আমাদের এ যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, এসলামের বিরুদ্ধে নয়। এ যুদ্ধ হবে অতি দীর্ঘ সময়ের, এত সহজে এ যুদ্ধ শেষ হবার নয়।' আমেরিকার কংগ্রেস সেদিন বুশকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন দেয়। আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ, জর্জ বুশ সমগ্র দেশে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত করে রণক্ষেত্র দক্ষিণ এশিয়ার দিকে পাঠানোর হুকুম জারি করেন। টার্গেট আল-কায়েদা ও তালেবান নিশ্চিহ্ন করা। তিনি 'আপাতত' ভুলে গেলেন যে এই আল-কায়েদা আর তালেবান তাদেরই সৃষ্ট এবং বিন লাদেনও তাদেরই প্রোডাক্ট। ব্রিটেনের লেবার পার্টির রাজনীতিক এবং বিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়ান রবিন কুক (Robert Finlayson "Robin" Cook, 28 February 1946 – 6 August

2005) গার্ডিয়ান পত্রিকায় মৃত্যুর মাত্র একমাস আগে একটি আর্টিকেলে এই সত্যটি স্বীকার করেন। আর্টিকেলে নামটি ছিল তার সত্যনিষ্ঠতা ও সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ: Al-Qaeda as a product of a western intelligence.

এতে তিনি সুস্পষ্টভাষায় বলেন যে, Bin Laden was, though, a product of a monumental miscalculation by Western security agencies. Throughout the 80s he was armed by the CIA and funded by the Saudis to wage jihad against the Russian occupation of Afghanistan.

অর্থাৎ, "বিন লাদেনও ছিলেন পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর একটি পর্বততুল্য ভুল হিসাবের পরিণাম। পুরো আশির দশকে তিনি রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য অস্ত্র সরবরাহ পেয়েছেন CIA-র থেকে এবং অর্থ পেয়েছেন সৌদি আরব থেকে।" ব্রিটেন যে মুহূর্তে ওসামা বিন লাদেনকে খোঁজার নাম করে আফগানিস্তান তছনছ করছে তখন ব্রিটেনেরই এক মৃত্যুপথযাত্রী পার্লামেন্ট মেম্বার যে জবানবন্দি দিয়েছেন সেটা আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয় যে, 'USA is a mother of producing Terrorist Groups.'

মাত্র কিছুদিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সেক্রেটারি অব স্টেট, সাবেক ফার্স্ট লেডি, প্রবীণ রাজনীতিক মিসেস হিলারি ক্লিনটন এই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আজকে আমরা যে আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি কুড়ি বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমরাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে অর্থ যুগিয়েছি।' এ কথাগুলো তিনি আগেও বলেছেন, কিছুদিন আগেও (১ জুন ২০১৪) আরেকবার সদম্ভে বললেন যা ফক্স নিউজ, সি.এন.এন-চ্যানেলে বিশ্ববাসী দেখেছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ এই সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। ওই প্রকল্পের আওতায় আফগানিস্তানের বাচ্চাদের পাঠ্যপুস্তকে সন্ত্রাস ও মারণাস্ত্র সম্পর্কিত অনেক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো হবে এমন তথ্যও অনায়াসে দেওয়া হয়েছিল পাঠ্যপুস্তকগুলোতে। তখন ইংরেজি বর্ণমালা পরিচয়ে 'জে'-তে জেহাদ শেখানো হতো। এমনকি গণনা শেখানোর সময় ৫ বন্দুক + ৫ বন্দুক = ১০ বন্দুক শেখানো হতো।

আজকের আফগানিস্তানের অবস্থার সৃষ্টিবীজ রোপিত হয়েছিল শেষ আফগান রাজা মোহাম্মদ জহির শাহের উৎখাত থেকে। ১৯৭৯ সনে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান দখল করে হয়তো ঐতিহাসিক ভুল করেছিল বলে সামরিক ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করবেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মানবতার বিরুদ্ধে এক বিরাট পাপ করেছিল। এ পাপটি হলো তাদের (রাশিয়ার) এ অভিযানের মধ্য দিয়ে আমেরিকাকে 'ক্রুসেড' আর 'জেহাদ'-কে একত্রিতকরণের সুযোগ করে দেয়া। স্বভাবসিদ্ধ হস্তে আমেরিকা

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জেহাদিদের লাগিয়েছিল, পরে এ জেহাদিরাই আমেরিকাপ্রদত্ত অস্ত্র তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দিল, কারণ তাদের মতে 'প্রকৃত জেহাদ' আমেরিকার বিরুদ্ধেই হতে হবে (দেখুন: আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা - ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন)।

আমাদের কথা হচ্ছে, আল কায়েদা যদি সন্ত্রাসী হয়ে থাকে, তাহলে যারা একে সৃষ্টি করল তারা কি? আসল কথা হচ্ছে, তখন বিন লাদেনকে তাদের দরকার ছিল, কারণ তারই নেতৃত্বাধীন আল কায়েদার অন্তর্ভুক্ত মোজাহেদিনরা 'মাল্টিপারপাস ফাইটার' হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন পলিসিকে বাস্তবায়ন করে দিয়েছে। যখনই তাদের দরকার ফুরিয়ে গেল তখনই তাদেরকে জেহাদি, জঙ্গি, সন্ত্রাসী বানিয়ে দেওয়া হলো। আবার কিছুদিন আগে গাদ্দাফির সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য এই আল কায়েদাকেই পুনর্বার অস্ত্র, অর্থ যুগিয়ে লিবিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই প্রবঞ্চনার শিকার, বুদ্ধিহত গণ্ডাডিয়েটরদের রক্তে লিবিয়ার মাটি আজও ভিজে আছে।

সাফল্যের সঙ্গে জঙ্গিবাদ রপ্তানি করল পশ্চিমা বিশ্ব

সুতরাং আফগান যুদ্ধ থেকেই জঙ্গিবাদের শুরু। এই যে আফগানফেরতা যোদ্ধারা যার যার দেশে ফিরে গেলেন, সেখানে গিয়ে তারাও ছোট ছোট দল গঠন করতে লাগলেন অথবা পূর্বে থাকা কোনো এসলামি দলে যোগ দিয়ে তার গতিপথকে প্রভাবিত করতে লাগলেন। বিশ্বের যতদেশে মোসলেম আছে মোটামুটি সবদেশেই এমন দলের সৃষ্টি হলো। উইকিপিডিয়ার একটি অসম্পূর্ণ তালিকায় বর্তমানে সক্রিয় সশস্ত্র এসলামি দলের নাম পাওয়া যায় ১০৪টি। তাদের উদ্দেশ্য প্রধানত ভৌগোলিক স্বাধীনতা হলেও এসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেরণাই তাদেরকে শক্তি যুগিয়েছে। আফগান জেহাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের একটি বড় উদাহরণ চেচনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী মোসলেম আন্দোলন। প্রথম ও দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারায় প্রায় তিন লক্ষ চেচেন মোসলেম।

আরেক ট্রাজেডি অনুষ্ঠিত হয় চীনের উইগুড়ে। আফগান জেহাদের সূচনালগ্ন থেকেই চীন তার নিজস্ব ভূকৌশলগত কারণে আফগান সংলগ্ন সিনজিয়াং প্রদেশের মোসলেম-প্রধান উইগুড় অঞ্চল এবং পাকিস্তানের আরো উত্তরোস্থিত রাশিয়ান কিরগিজ মোসলেমদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে আরম্ভ করে। এই প্রশিক্ষণ এবং জেহাদিদের অস্ত্রায়নসহ যাবতীয় বিষয়ে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পূর্ণ খরচ CIA বহন করে। এ সময়ে চীন প্রায় ৫০,০০০ মোজাহেদদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এই প্রশিক্ষণার্থী মোসলেমের সন্তানেরা একবারও ভাবল না যে, কম্যুনিস্ট দানব সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছে আরেক কম্যুনিস্ট দানব চীন, এখানে তারা কেন জীবন দেবে? যদি সোভিয়েত হারেও জয়ী হবে আমেরিকা-চীন, মোসলেমদের কী লাভ? কিন্তু এসব ভাবার অবসর তাদের হয় নি, এটাই ইতিহাস। CIA-র কাছে আত্মবিক্রিত আলেমদের হৃদয় কাঁপানো

উদ্দীপক ওয়াজে তারা জেহাদের জন্য এতটাই উদ্বুদ্ধ যে তাদের এই সাধারণ জ্ঞানও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে তাদের যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় হচ্ছে না, উল্টো তারা এবং এসলাম উভয়েই পরিণত হয়েছে দুই দানবের যুদ্ধের হাতিয়ারে। এই দানবেরা চায় না এ যুদ্ধে নিজেদের লোকক্ষয় হোক, এজন্যই মূল্যহীন মোসলেমদেরকে এত প্রশিক্ষণ দেয়ার ঘটা। মোসলেমদেরকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে প্রয়োজন তাদের ধর্ম এসলামের। তাই যখন যুদ্ধ শেষ হবে, তখন এসলাম ও মোসলেমরা ধ্বংস হলেও তাদের কিছু এসে যায় না, বরং ধ্বংস হওয়াই বুদ্ধিমান শত্রুর কাম্য হওয়া স্বাভাবিক।

নিষ্ঠুর পরিহাস হচ্ছে, সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগের পর সেই চীনারা এখন ঠিকই যুদ্ধ করছে। তবে সেটা করছে সেই উইগুড় মোসলেম জেহাদিদের বিরুদ্ধেই, যাদেরকে তারা নিজেরাই প্রশিক্ষণ দিয়ে জঙ্গি বানিয়েছে। এজন্য তারা একটি অজুহাত দাঁড় করিয়েছে যে উইগুড় মোসলেমদের এ বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনে তালেবানরা সহযোগিতা করছে। এ অভিযোগ তুলে ২০০১ সনে আবার চীন আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী জোটের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে যারা উভয়েই কিছুদিন আগে ছিল মোসলেমদের 'পরম বন্ধু'।

১৯৮৫ সনের মাঝামাঝি ওসামা বিন লাদেনের সান্নিধ্যে আফগান জেহাদে সামিল হবার জন্য CIA-এর হিসাব অনুযায়ী আরব-মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ যথা সৌদি, ইয়ামেন, আলজেরিয়া, মিশর, তিউনেশিয়া, ইরাক, লিবিয়া, জর্ডান থেকেই এসেছিল ১৫,০০০ জেহাদি। পরে এ সংখ্যা বেড়ে ৩০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। আফগান যুদ্ধের শেষে এদের মধ্যে এক থেকে দেড় হাজারের মতো আলজেরিয়ার সরকারবিরোধী এসলামি কট্টরপন্থী বলে কথিতদের সাথে গৃহযুদ্ধে অংশগ্রণের জন্য আলজেরিয়ায় চলে আসে। স্মরণ থাকে যে, আলজেরিয়ার ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যেই ১৯৯২ সনে নির্বাচন হলে সে নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (FIS) প্রথম পর্যায়ের ভোটে ১৮৯ আসন দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগুচ্ছিল, কিন্তু সে দেশের পশ্চিমা ভাবাদর্শের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট সরকার এবং সেনাবাহিনী এ ফলাফল বাতিল করলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো সেদিন গণতন্ত্র বাঁচাতে এগিয়ে আসে নি। কারণ স্যালভেশন ফ্রন্ট একটি এসলামি আন্দোলন। ১৯৯২-৯৮ পর্যন্ত চলমান এ গৃহযুদ্ধে প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) লোকের প্রাণহানি হয়। আলজেরিয়ার এ যুদ্ধ এখনো চলছে আর ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট- এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে আর্মড ইসলামিক গ্রুপ (GIA)।

আফগান ফেরত যোদ্ধারা মিশরে ফিরে আল-জেহাদ এবং আল জামিরার মতো সংগঠনগুলোতে যোগ দেয়। এর মধ্যে প্রায় ২০০ আরব-আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স দ্বারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত আফগান জেহাদ ফেরত সদস্যরা নিউ ইয়র্কের নিউজার্সি এরিয়াতে ফিরে আসে। ক্রমেই আল-কায়েদা আর তালেবান একই সূত্রে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় জেহাদের প্রতিকরূপে গড়ে ওঠে। এদের যোদ্ধারা আজারবাইজান থেকে শুরু করে চেচনিয়া, নগরনো-কারাবাগ, কিরগিজিস্তান, তাজাকিস্তান, দাগেস্তান এবং উইগুড়সহ

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আফগান মোজাহেদরাও কোনো না কোনো পর্যায়ে কাশ্মিরে ‘স্বাধীনতা যুদ্ধে’ জড়িয়ে পড়লে পাক-ভারত সম্পর্ক অবনতির নিম্নধাপে পৌঁছে। (দেখুন: আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা: আফগানিস্তান হতে আমেরিকা - ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন)

যে দেশগুলোতে এককালে ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তাদের সিস্টেম চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সে দেশগুলোতেই জঙ্গিবাদ বেশি প্রসারিত হলো। ‘কালো মানুষের দেশ’ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ গেড়েছিল ব্রিটেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, জার্মান, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, সুইডেন ইত্যাদি দেশগুলো। শোষণ করতে করতে যখন দেশগুলো ছিবড়ে হয়ে গেল, তখন উপনিবেশগুলোকে গুটিয়ে নিল শোষক জাতিগুলো, কোথাও কোথাও পরাধীনগোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত হলো। এই দেশগুলোতে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীনতাকামী একটি শ্রেণি যারা শাসকের নির্যাতন নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু সর্বত্রই তারা যাওয়ার সময় তাদের প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ‘আধুনিক’ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা, তাদের পদলেহনকারী দাসমনোবৃত্তির শিক্ষিত শ্রেণির হাতে শাসনক্ষমতা দিয়ে নিজেদের রচনা করা সিস্টেম এই দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়ে গেল। যেমন আমাদের উপমহাদেশের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ইত্যাদি দলের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে চাপিয়ে দিয়ে গেছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, অন্য কোথাও দিয়ে গিয়েছিল একনায়কতন্ত্র, কোথাও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি।

আফগানযুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলোকে এসলামের জেহাদি চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা হলো, যদিও সেটা প্রকৃত এসলাম ছিল না। এভাবেই মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, লেবানন, ইয়ামেন ছিল ফ্রান্সের অধীন, বাহরাইন, ইরাক, কুয়েত, ওমান, কাতার, প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ আরব, ট্রান্সজর্ডান ইত্যাদি ছিল ব্রিটেনের অধীন, রাশিয়া আর পর্তুগিজের অধীনেও ছিল উল্লেখযোগ্য এলাকা। এসব এলাকাগুলোতেই জঙ্গিবাদ বিরাট আকার ধারণ করেছে, যার প্রধান কারণ শতবর্ষের নির্যাতন, নিষ্পেষণ, পরাধীনতার গণ্ডানি থেকে মুক্তিকামী মানুষের জীবনতৃষ্ণা; ঠিক যেভাবে একাত্তর সনে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণমূলক বিষমনীতির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের মুক্তিপাগল জনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন, “১৯৯১-৯২ সনের মধ্যেই আল-কায়েদার শাখা বিভিন্ন মোসলেম দেশে গড়ে উঠতে থাকে আর সে সাথে নতুন রিক্রুটদের আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পাঠাতে থাকে। গড়ে ওঠে সোভিয়েত রাশিয়ার পরিত্যক্ত সেনা ছাউনি এবং ওসামা বিন লাদেনের নিজস্ব তৈরি কেন্দ্রগুলোতে সামরিক প্রশিক্ষণ। এসব নব সদস্যদের বেশিরভাগকেই CIA এবং স্পেশাল ফোর্সের ম্যানুয়েল মোতাবেক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে এসব জেহাদিরা প্রশিক্ষণে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। এ ধাপটি হলো, বেশিরভাগ আল কায়েদা জেহাদিদের আত্মঘাতী হবার মানসিকতা অর্জনের প্রশিক্ষণ। আর এ কারণেই এসব জেহাদিরা খোদ

CIA এবং আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকে। কারণ আত্মঘাতী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।”

নির্যাতিত মোসলেম ঘুরে দাঁড়ালেই ‘সন্ত্রাসী’

জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলা একটি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিষয়। কিন্তু যুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা নতুন কোনো কৌশল নয়, এটা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তবে এসলামের নামে যে আত্মঘাতী হামলা চালু হয়েছে এর প্রধান সূতিকাগার ফিলিস্তিন। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের ট্যাংক আর জঙ্গি বিমানের বিরুদ্ধে গুলতি আর ইট পাথর ছুঁড়ে যুদ্ধ করেছে, এই দৃশ্য বিশ্বের মানুষ প্রতিদিন দেখেছে। ফিলিস্তিনিদেরকে নিজেদের ভূমি থেকে বিতাড়ন করে দেওয়া হয়েছে। তারা যখন দেখেছে যে তাদের মা-বোনের ইজ্জত হরণ করা হচ্ছে, তাদের বাবা-মা আর নিষ্পাপ শিশুদের প্রাণহীন টুকরো টুকরো দেহ নিয়ে মিছিল করতে হচ্ছে, তখন যে প্রতিশোধের আগুন তাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে সেটাই তাদেরকে আত্মঘাতী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের নিজেদের জীবনকে তারা তুচ্ছ করতে শিখেছে। তাদের এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীময় হাজার হাজার মোসলেম যুবককে বুকে বোমা বাঁধার প্রেরণা যুগিয়েছে। এরাই দেশে দেশে জঙ্গি সংগঠনগুলোতে নাম লেখাচ্ছে।

আজকে সারা পৃথিবীতে যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার জন্য সর্বপ্রথম সন্দেহ করা হয় মোসলেমদেরকে, কারণ এখন এসলাম আর সন্ত্রাসকে প্রায় সমার্থক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি পরিসংখ্যান নিয়ে বসি, দেখব পৃথিবীতে গত শতাব্দীতে যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়েছে তার সিংহভাগই করেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগঠনগুলো। এদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো অনেকাংশেই রাষ্ট্র-প্রণোদিত (State-sponsored terrorism) অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, উত্তর কোরিয়া, কলম্বিয়া ইত্যাদি সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ফরেন পলিসির অন্তর্ভুক্ত। অ-রাষ্ট্রীয় বড় বড় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মধ্যে আছে ইতালির রেড ব্রিগেড, ফ্রন্ট লাইন, জার্মানির রেড আর্মি ফ্যাকশন ইত্যাদি। এদেরই ভাবধারায় আমাদের উপমহাদেশেও বহু সাম্যবাদী সন্ত্রাসী দল যেমন কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ও নকশাল (মাওবাদী), তামিল টাইগার, বাংলাদেশের সর্বহারা ইত্যাদি। এদের অপরাধের নমুনা দেখলে গা শিউরে ওঠে। অথচ বিশ্বের প্রধান দশটি সন্ত্রাসী দলের তালিকায় একটিমাত্র সমাজতান্ত্রিক দলের নাম রয়েছে, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – FARC, যার অবস্থান সপ্তম স্থানে, বাকি সবগুলো এসলামিক। আর ঋইও-এর প্রকাশিত টপ টেররিস্ট তালিকায় ২২ জনের নাম রয়েছে যাদের সকলেই মোসলেম (সূত্রঃ Most wanted terrorists list released". CNN. October 1, 2001. Retrieved July 18, 2008.)।

আমার বক্তব্য থেকে যেন কেউ ধারণা না করেন যে, আমি জঙ্গিদের পক্ষে সাফাই গাইছি। ধর্ম-বর্ণ-মতবাদ নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীই মানবজাতির শত্রু, কাউকেই এ ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। আমার কথা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীদের এখন টার্গেট কম্যুনিজম ধ্বংস করা নয়, ও পর্ব শেষ। এখন টার্গেট হচ্ছে এসলাম, তাই মোসলেমদের সামান্য অপরাধও বিরাট করে তুলে ধরা হচ্ছে। এসব কারণেই আজকে দুনিয়াজোড়া যুদ্ধ, বিক্ষোভ, সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে মোসলেম জনগোষ্ঠী, তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকেও জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করে নিন্দা করা হচ্ছে। এজন্য বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, এই মোসলেমদের উপর বিগত তিনশত বছরে কী পরিমাণ নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে, সেটা যারা চালিয়েছে এবং চালাচ্ছে তারা সবাই দুধে ধোয়া তুলসি পাতা। জমিদারের হাতে নিজের বাড়ি-ঘর সম্পত্তি সব হারিয়ে উদ্বাস্তু উপেন যখন দীর্ঘদিন পরে নিজের হারানো ভিটা দেখতে ফিরে এলো, নিজের হাতে লাগানো আমগাছের নিচে বসে নিজের ছেলেবেলার কতশত মধুর স্মৃতি তার মনে ভেসে উঠতে থাকে। বাতাসের ঝাপটায় একটি আম ঝরে উপেনের সামনে পড়ে। শ্রান্ত উপেন আমটি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে চায়। এ সময় জমিদারের লোকেরা উপেনের দিকে তেড়ে আসে আর তাকে আমচোর বলে ভর্ৎসনা করতে থাকে। তখন উপেন স্বগতোক্তি করেছিল-

শুনে আমি হাসি, আঁখিজলে ভাসি- এই ছিল মোর ঘটে!

তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।

আজ সিরিয়ায় যে জঙ্গিবাদী বিদ্রোহীরা একনায়ক বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, গণহত্যা চালাচ্ছে তাদেরকেও প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র সরবরাহ করছে ব্রিটেন। এই অন্যায় পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে কিছুদিন আগে পদত্যাগ করলেন কনজারভেটিভ পার্টির রাজনীতিক, পার্লামেন্টেরিয়ান ও মন্ত্রী ব্যারোনেস সাইয়েদা ওয়ার্সি। আজ যুক্তরাষ্ট্র যে ওঝ এর বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে নেমেছে সেই ওঝ-ই কিছুদিন আগে সিরিয়ায় বিদ্রোহীদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন তারাও পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্য পেয়েছে। এভাবেই পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো সৃষ্টি করেছে জঙ্গিবাদ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আর জিইয়ে রাখছে বিশ্বজোড়া অস্ত্র ও ধর্মব্যবসার জমজমাট বাজার।

আরববিশ্বের মোনাফেকি ও ধর্মব্যবসার কদর্যতা

সৌদি আরবকে এখনও যদি কেউ এসলামের ধারক বা রক্ষক বলে মনে করেন তবে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। ব্রিটিশ-মার্কিন জোট যেভাবে আজ বিশ্বময় জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছে, ঠিক কয়েক শতাব্দী আগে ব্রিটিশরাই মোসলেমদের ওহাবি বলে একটি ফেরকার সৃষ্টি করেছে। আরবের রাজপরিবার এই ওহাবি ফেরকার অনুসারী, যারা মূলত পশ্চিমা বিশ্বের অধীন গোলাম ও অর্থ যোগানদাতামাত্র।

আগেই বলেছি, আফগানিস্তানে এসলামকে কট্টরবাদীদের হাতে তুলে দেবার পেছনে CIA আর ওঝও - এ দুটি সংস্থা দায়ী। আর এই দুই সংস্থার পেছনে যে সব মোসলেমপ্রধান দেশের নেতাদের নাম জড়িত রয়েছে তারা হলো জিয়াউল হক, বাদশাহ ফাহাদ আর আনোয়ার সাদাত। সোভিয়েতবিরোধী 'জেহাদে' সৌদি আরব ওহাবি আন্দোলনকে আফগানিস্তানে প্রাধান্য দিয়েছে এবং ওহাবি গরিষ্ঠ মোজাহেদ দল ইত্তেহাদ-ই-ইসলামি'র মতো কট্টরপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। দশ বছর সময়ের মধ্যে এ ওহাবি আন্দোলন বেশ শক্তি সঞ্চয় করে। এ কারণে সৌদি সরকার প্রচুর অর্থ খরচ করেছে। উল্লেখ্য, ওসামা বিন লাদেন এবং তার সৌদি অনুগামীরা ওহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত। পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে যে জঙ্গিবাদ এবং দেশজুড়ে যে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা তার পেছনেও আছে মার্কিন আর আরব জোটের অর্থায়ন। ২০১৩ সনের ফেব্রুয়ারিতে গেণ্ডাবাল রিসার্চ এর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল Destroying a Nation State: US-Saudi Funded Terrorists Sowing Chaos in Pakistan. প্রায় একই শিরোনাম করেছিল দ্য টেলিগ্রাফ (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭), US funds terror groups to sow chaos in Iran.

জঙ্গিবাদসহ এসলামের নামে যেসকল ধর্মব্যবসা আজ বিশ্বময় চলছে সেগুলোর সূতিকাগার ও পোষকদেহ এই সৌদি আরব ও তাদের প্রভাবাধীন আরববিশ্ব। আরবদেশ রসুলাল্লাহর জন্মভূমি এবং এখানেই বায়তুল্লাহ শরীফ - শুধু এই সুবিধাটুকু ভাঙিয়ে তারা ধর্মব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান আরবদের গায়ের লেবাস, দাড়ি, টুপি, পাগড়িসহ শুধু বাহ্য বেশভূষা ছাড়া এসলামের কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাদের জীবনে যেহেতু আল্লাহর রসুলের শিক্ষার কোনো প্রভাব নেই অথচ দেশে শরিয়ার দণ্ডবিধি চালু কাজেই এরা যতক্ষণ দেশের ভেতরে থাকে ততক্ষণ বিশেষ অপরাধ, গোনাহ করে না, কারণ শরিয়াহ আইনে অন্যায়ের শাস্তি কঠোর (অবশ্য এই চিত্র ২০/৩০ বছর আগের, বর্তমানে এদের সামগ্রিক অবস্থা ভয়াবহ)। কিন্তু একবার দেশের বাইরে যেতে পারলেই এরা পরিণত হয় দুরাচারী মানবেতর জীবে। তাকওয়া, আল্লাহভীতির কোনো প্রভাব এদের ব্যক্তি জীবনে নেই বলে এদের নিজেদের লোভ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নিজের দেশে থাকলে এগুলোর যা কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে তা শুধু শাস্তির ভয়ে। কাজেই দেশের বাইরে যেতে পারলে এরা লাগামহীনভাবে জীবন উপভোগ করে। আল্লাহ তাদেরকে অঢেল সম্পদ দিয়েছেন, এ সম্পদ ব্যয় করার জায়গা তারা পাচ্ছে না। সে সম্পদ ভোগ করার জন্য লালায়িত ওহাবিরা ব্যক্তিস্বার্থে পাশ্চাত্যের যে কোনো হুকুম একপ্রকার প্রভুভক্ত প্রাণীর মতো পালন করে, লাথি খেয়েও প্রভুর পদলেহন করে যায়। এই দেশগুলোর বাদশাহ ও আমীরদের এলাহ হলো তাদের যার যার সিংহাসন ও আমিরত্ব। এই সিংহাসন ও আমিরত্বের নিরাপত্তার জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কথায় ও আদেশে ওঠেন বসেন, অন্য মোসলেম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। মুখে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে লোক দেখানো চিৎকার করলেও কার্যত ইসরাইলের ক্ষতি হবে এমন কোনো কাজ তারা করেন না, ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন না। কারণ তা করতে গেলে প্রভু যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ বিরক্ত

হবে এবং তাতে তাদের সিংহাসন ও আমিরত্ব হারাতে হতে পারে। যদি এমন কোনো পরিস্থিতি কখনও হয় যে তাদের সিংহাসন বা আমিরত্ব রক্ষা এবং কাবা ধ্বংস করা এ দু'টোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ধর্মব্যবসায়ী পথভ্রষ্ট এই আরবরা কাবা ধ্বংসকেই বেছে নেবেন!

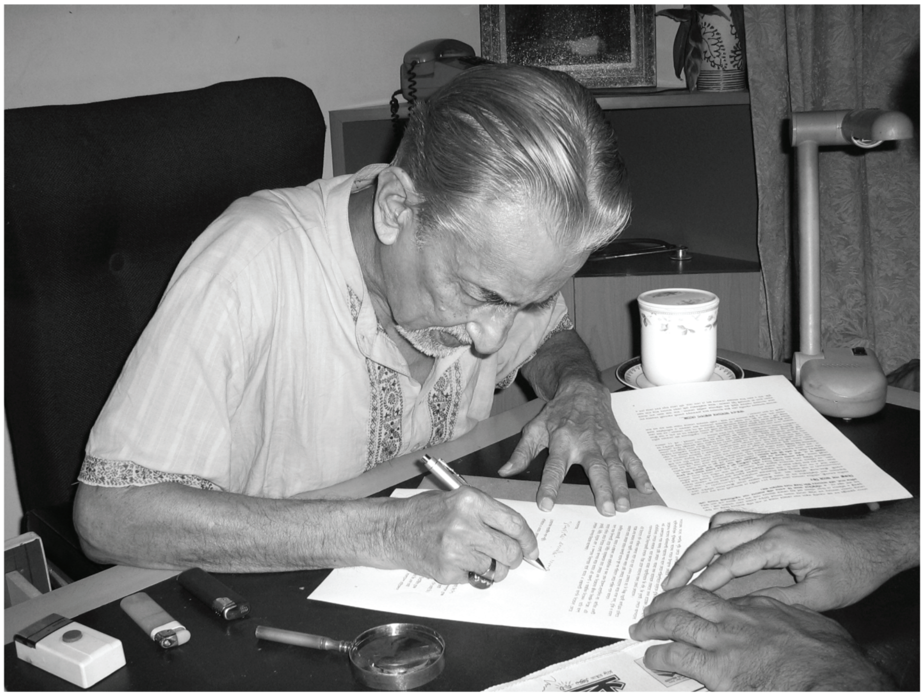
মনে রাখতে হবে, এসলাম নয় কেবল, কোনো ধর্মেই ধর্মব্যবসা বৈধ নয়। কারণ ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণের জন্য, কেউ যদি একে ব্যবসার মাধ্যমে পরিণত করে তবে স্বভাবতই এটি বিকৃত হয়ে যাবে, এটা দিয়ে আর মানুষের কল্যাণ হবে না, শান্তি আসবে না। ধর্ম প্রেরণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে এই পশ্চিমা 'সভ্যতা' মোসলেম দেশগুলোকে দখল করে সেখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এমন এক বিকৃত এসলাম শিক্ষা দিয়েছে যেটা দিয়ে ঐ আলেম মোল্লাদের রুজি-রোজগারের চেয়ে বেশি কিছু হওয়া সম্ভব নয়, সমাজে শান্তির আসার চিন্তা সুদূর পরাহত (অবশ্য বর্তমানের বিকৃত ধর্মগুলির কাছে শন্তির আশা আজ আর কেউ করেও না)। তারা ঐ মাদ্রাসাগুলোতে কর্মমুখী কোনো শিক্ষা না দেয়ায়, দুনিয়াবি জ্ঞান বিজ্ঞানের কোনো শিক্ষা না দেয়ায় মাদ্রাসাশিক্ষিত মানুষগুলোর ধর্ম বেচে খাওয়া ছাড়া আর কোনো পথও রইল না। যতদিন মানুষ ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে ততদিনই এই ধর্মব্যবসায়ীরা কিছু করে খেতে পারবে, এজন্যই তারা ধর্মকে নিজেদের হাতছাড়া করতে চায় না। তারা নিজেদের ধর্মীয় বিকৃতজ্ঞানকে জাহির করার জন্য যত্রতত্র ফতোয়াবাজি, ওয়াজ নসিহত করে। তাদের এইসব ওয়াজ-নসিহত ও ফতোয়াবাজি দ্বারা জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নেতিবাচক ফ্যাক্টরগুলো বিস্তারলাভ করে। যেমন, ধর্মীয় সুর আর স্বরগ্রামে (Tone) কথা বলে তারা খুব সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কাফের, নাস্তিক আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ জনতাকে উন্মাদ করে দিতে পারে, এভাবে তারা মানুষ হত্যা, ভাঙ্গচুরসহ যে কোনো ভয়াবহ সহিংসতা ঘটাতে পারে। বলা বাহুল্য যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর পেছনে রাজনীতিক ইন্ধন থাকলেও নেতৃত্ব দেয় ধর্মব্যবসায়ীরাই। কাজেই জঙ্গিবাদ যেমন পশ্চিমাদের সৃষ্টি তেমনি ধর্মব্যবসাও তাদেরই সৃষ্ট হাতিয়ার বিশেষ। এই দুটি মারাত্মক ব্যাধি মোসলেম দুনিয়াকে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

জঙ্গিবাদের সমাধান?

গত দেড়যুগ ধরে জঙ্গিবাদ সারা বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রক্তের বন্যায় লাল হয়ে গেছে পৃথিবীর মাটি, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আফগানিস্তান, ইরাক। পাকিস্তান, সিরিয়া, নাইজেরিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সকল মোসলেম দেশেই জ্বলছে জঙ্গিবাদ নামক সহিংসতার আগুন। কেবল ইরাকেই মারা গেছে ১০ লক্ষ আদম সন্তান। জঙ্গিদেরকে যতই জোর করে দমনের চেষ্টা করা হচ্ছে, ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে ততই তাদের উগ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা আরও বেপরোয়া হয়ে

উঠছে, এমনকি তারা আত্মঘাতীও হচ্ছে। এভাবে দিন কে দিন বেড়েই চলেছে ধর্মের নামে সহিংসতা আর জনগণের দুর্ভোগ কিন্তু সমাধান আসছে না। দীর্ঘ দেড় যুগের এত অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির পর অবশ্য এখন জ্ঞানী-গুণীরা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন যে, শুধু শক্তিপ্রয়োগে, সামরিক কায়দায় জঙ্গিবাদ দমন করা সম্ভব নয়; কারণ জঙ্গিবাদ কোনো সাধারণ ও বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়, এটি একটি বিকৃত আদর্শ। এই আদর্শ যতদিন টিকে থাকবে, জঙ্গিবাদও ততদিন টিকে থাকবে। তাই একে মোকাবেলাও করতে হবে আদর্শ দিয়েই। গত ২৮ আগস্ট' ২০১৩ তারিখে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল "বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা"-র উপর একটি অনুষ্ঠানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল এসলাম বলেন, "জঙ্গি কর্মকাণ্ডের পেছনে একটি আদর্শ থাকে। আদর্শকে আদর্শ দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে।" এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী বলেন, "জঙ্গিবাদ দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা যথেষ্ট নয়। কারণ জঙ্গিবাদ হচ্ছে একটি আদর্শগত যুদ্ধ। সে হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এখনো কিছুই করে নি।"

অর্থাৎ তারা বোঝাতে চাইছেন যে, কোর'আন হাদিসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নামক যে ভুল মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে সেই আদর্শিক যুদ্ধে জয়ী হতে হলে কোর'আন-হাদিসের উক্ত বিষয়গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা মানুষকে জানাতে হবে। ঠিক এই কথাটিই কয়েকবছর পূর্বে বলেছিলেন যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ২০০৯ সনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি একটি চিঠি দিয়েছিলেন যেখানে তিনি সরকারকে আদর্শিক যুদ্ধের মাধ্যমে জঙ্গিদমনে সহায়তা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ এই আদর্শিক যুদ্ধে জঙ্গিদের পরাজিত করতে হলে তাদের আদর্শের বিপরীতে কোর'আন ও সুন্নাহ ভিত্তিক যে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দরকার, সেই যুক্তি প্রমাণ আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন।



মাননীয় এমামুয্‌যামান জঙ্গিবাদ নির্মূলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করার প্রস্তাবনাপত্রে স্বাক্ষর করছেন। (তারিখঃ ২১/০৪/২০০৯)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি
মাননীয় এমামুয্‌যামানের প্রেরিত সেই চিঠি

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

২২/০৪/২০০৯ ঈসায়ী

মাননীয়,

প্রধানমন্ত্রী,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে,

বর্তমানে সারা বিশ্ব এক মহা সংকটকাল অতিক্রম করছে। সন্ত্রাসবাদ, আর্থনীতিক মন্দা ইত্যাদি কারণে সমগ্র বিশ্ব চরম অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে পতিত হয়েছে। বিশেষ করে এসলামিক সন্ত্রাসবাদ প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্বকে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের দেশও এ সমস্যার বাইরে নয়। বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মোকাবেলায় তারা শক্তিপ্রয়োগকে (Violence) নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরও এই পথে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে (War on terror) যে জয়ের ব্যাপারে তারা একসময় নিশ্চিত ছিল তা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রশ্নটি হচ্ছে-

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সফলতা আসবে কি?

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো তাদের বিশাল শক্তি, অর্থ ব্যয় করে বিশ্বময় সন্ত্রাস মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও বক্তব্যের মধ্যেই তাদের ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠছে। তাদের অধিকাংশই একমত যে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নেতৃত্বদানকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্প্রতি সি.বি.এস টেলিভিশনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, US Afghan plan must have 'exit strategy.' যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান থেকে নিরাপদে চলে আসার পথ সুগম করতে হবে।১

একই মত প্রকাশ করেছেন আফগান যুদ্ধে নিয়োজিত ব্রিটিশ সেনা সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মার্ক কার্লটন স্মিথ। তিনি বলেন যে, "The Afghan war is un-winnable. অর্থাৎ-আফগান যুদ্ধে কোনোভাবেই জেতা সম্ভব নয়।২ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক রিচার্ড হলব্রুকও আফগান যুদ্ধের জয় সম্পর্কে একই মত প্রকাশ করেছেন- First of all, the victory, as defined in purely military terms, is not achievable অর্থাৎ প্রথম কথাই হচ্ছে, সামরিক পরিভাষায় জয় বলতে যা বোঝায় এখানে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।৩ এ যুদ্ধে যৌথবাহিনীর সহায়ক শক্তি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারিও বলেছেন, US failed to accomplish desired goals so far in Afghanistan অর্থাৎ আফগানিস্তানে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।৪

শক্তিপ্রয়োগ করে সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রচেষ্টা যে শুধু সফলই হচ্ছে না, তাই নয় বরং ইরাক, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তানসহ যেখানেই যত বেশি শক্তিপ্রয়োগ করা হয়েছে সেখানেই সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন ও বেপরোয়া আক্রমণ তত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

মার্কিন নেভাল পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলের সমর বিশেষজ্ঞ মি. আরকুইলা সন্ত্রাসী হামলার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সম্পর্কে বলেছেন যে, “It is most curious that the areas where we have military operations have the most attacks.” অর্থাৎ-এটা সাংঘাতিক অনুসন্ধানজ্ঞাপক বিষয় যে, যেখানেই আমরা সামরিক অভিযান চালিয়েছি সেখানেই আমাদের উপর সবচেয়ে বেশি হামলা করা হয়েছে।৫ গত দুই বছরেরও কম সময়ে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় ১৭০০ মানুষ নিহত হয়েছে।৬ বিগত কয়েকমাসে এ হামলার পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। পাশাপাশি যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবিরোধীদেরকে নাজেহাল করে ফেলছে তা হলো আত্মঘাতী বোমা হামলা।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে সর্বত্রই সন্ত্রাসীরা আত্মঘাতী হামলার কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রায় প্রতিদিনই বিশ্বের কোথাও না কোথাও আত্মঘাতী বোমা হামলা চলছেই। দিন দিন এ ধরনের হামলার তীব্রতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুধু এক ইরাকেই আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে মোট ১২৬০টিরও উপরে অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে ২০৯টিরও বেশি। একই বছরে এ ধরণের হামলা হয়েছে সর্বোচ্চ ৪৭৮টি।৭ এ হামলাগুলো যে শুধু তরুণরা করছে তা নয়। সব ধরণের মানুষ, বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের পুরুষ ও নারী নিজেদের শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, এমনকি অনেক গর্ভবতী নারীও আত্মঘাতী হয়েছেন। সন্ত্রাসীদেরকে দমন করার জন্য যারা মরিয়া তাদের সবাই এখন একবাক্যে স্বীকার করছেন যে তাদের পক্ষে আত্মঘাতী হামলা বন্ধ করা সম্ভব নয়, নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়। কাবুলে নিয়োজিত ন্যাটো পরিচালিত International Security Assistance Force (ISAF) এর মুখপাত্র মেজর ল্যূক নিটিং বলেছেন, “It is simply impossible for law enforcement agencies to prevent suicide attacks since they could not be predicted and, therefore, not to be averted.” অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে আত্মঘাতী বোমা হামলা বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। যেহেতু কখন হামলা হবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না, তাই এটি এড়ানোও সম্ভব নয়।৮

কল্পনাতীত ব্যয়ঃ

গত প্রায় ৭/৮ বছর ধরে পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা আমাদের ধারণারও অনেক বাইরে। ২০০৮ সনে শুধু ইরাক যুদ্ধের পেছনে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মাসে ১২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। এ যুদ্ধে তাদের এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে মোট ৬,৪৯,৪৮,৪২,২৩,৩৫৮ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪,৫৪,৬৩,৮৯,৫৬,৩৫,০৬০ টাকা। প্রতি সেকেন্ডে ব্যয় হচ্ছে ৫,০০০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩,৫০,০০০ টাকা। প্রতি মার্কিন সৈন্যের জন্য এক বছরে খরচ হয় ৩,৯০,০০০ ডলার বা দুই কোটি তেহাত্তর লক্ষ টাকা (প্রতি মার্কিন ডলার ৭০ টাকা হিসাবে)।৯ আফগান যুদ্ধে ব্যয় হয়েছে এর চেয়ে আরো অনেক বেশি, কারণ সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তারও দুই বছর আগে। আজ

সারা দুনিয়া যে ভয়াবহ আর্থনীতিক মন্দার সম্মুখীন হয়েছে এ বিপুল অর্থব্যয় তার অন্যতম প্রধান কারণ।

সুতরাং সন্ত্রাসবিরোধী এ যুদ্ধের নেট ফল হচ্ছে-সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ করে, অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেও সন্ত্রাসীদেরকে দমন তো করা যাচ্ছেই না বরং তাদের হামলা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং এ যুদ্ধের ব্যয় যোগাতে গিয়ে সারা বিশ্ব চরম আর্থনীতিক মন্দার শিকার হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মিডিয়াগুলোও নিরবচ্ছিন্ন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ক্রমশই দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ বিস্তার লাভ করছে। ব্রিটেনের একটি স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা গেছে ২০০৮ সালের জুন মাসে সেখানে মাত্র ১০টি শিশুর সন্ত্রাসী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অথচ মাত্র ৯ মাস পরে এমন শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ তে।১০ খোদ ব্রিটেনের যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে মোসলেমপ্রধান দেশগুলোর অবস্থা কী তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ দশকের শুরু থেকেই কতগুলো সংগঠন আমাদের দেশেও তাদের উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। আজ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, সারা দেশের প্রায় সবকটি জেলায় সন্ত্রাসীরা একযোগে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, অনেকগুলো আত্মঘাতী বোমা হামলাও সংঘটিত হয়েছে, অনেক নিরীহ মানুষ হতাহত হয়েছেন। আমাদের দেশেও তাদেরকে দমন করার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের মতো শক্তি প্রয়োগের নীতিই (Violence) গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রপাতি উদ্ধার করা হচ্ছে। সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ, শ্রম, সময় ব্যয় করে এবং মিডিয়ার নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের মাধ্যমে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগেও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অত্যাধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে, এমন প্রায়ই হচ্ছে। শক্তিপ্রয়োগ করে চরমপন্থীদের দমন করার চেষ্টার ব্যর্থতা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে পশ্চিমা শক্তিগুলোর ও পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের পরও ১৩/০৪/২০০৯ তারিখে পাকিস্তানকে তালেবানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আসতে হয়েছে এবং পাকিস্তান সরকার সোয়াতে এসলামি শরিয়াহ আইন চালুর অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে সারা পৃথিবীতেই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় দমননীতি ও সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হবার পর সকলেই এখন বিকল্প পথ খুঁজছে।

শক্তিপ্রয়োগের বিকল্প পথ খুঁজছে পশ্চিমা বিশ্বঃ

যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে কী কল্পনাতীত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে চলেছে তার পরিসংখ্যান একটু আগেই দিলাম। তাদের মতো মহাশক্তির পক্ষেও আর সম্ভব হচ্ছে না এ যুদ্ধ বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া কারণ যুদ্ধের সীমাহীন ব্যয় মেটাতে গিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও দিন দিন আরো সংকটজনক হয়ে যাচ্ছে।

বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী শক্তি প্রয়োগের (Violence) বিকল্প পথ খুঁজছে। ২০০৭ এর গোড়ার দিকেই মার্কিন নেভাল পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলের সমর বিশেষজ্ঞ মি. আরকুইলা ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী হামলার পরিসংখ্যান সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "These statistics suggest that our war on global terrorism is not going very well. It suggests we need to try a new approach."

অর্থাৎ- এ পরিসংখ্যান আমাদেরকে বলে দেয় যে, বিশ্বব্যাপী যে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ আমরা শুরু করেছি তার অবস্থা খুব ভালো নয়। এ পরিসংখ্যান আরো বলে যে এখনই আমাদের বিকল্প কোনো পথে চেষ্টা চালানো দরকার।[১১]

অতি সম্প্রতি ব্রিটিশ সেনা সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মার্ক কার্লটন স্মিথ ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে বলেন যে, "The war against the Taliban cannot be won. British public should not expect a 'decisive military victory' but should be prepared for a possible deal with the Taliban. অর্থাৎ- তালেবানদের সাথে যুদ্ধ করে জেতা যাবে না। তাই ব্রিটিশ নাগরিকদের এ যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় আশা করা ঠিক হবে না, বরং তালেবানদের সাথে সম্ভাব্য কোনো আপস-মীমাংসায় আসা হতে পারে এমনটি দেখার জন্যই তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত হবে।[১২] অর্থাৎ তিনিও যুদ্ধ ছাড়াও বিকল্প পথের কথা ভাবছেন। এমনকি ২৮ মার্চ, ০৯ তারিখে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে তার নতুন রণকৌশল (New Strategy) প্রসঙ্গে বলেন, A campaign against extremism will not succeed with bullets or bombs alone. অর্থাৎ চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে শুধু বুলেট ও বোমা দিয়ে সফল হওয়া যাবে না।[১৩]

যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মতো মহা পরাশক্তি সন্ত্রাস দমন করতে পারছে না এবং শক্তি প্রয়োগের বিকল্প পথ চিন্তা করছে সেখানে আমাদের মতো দরিদ্র দেশের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আর যুক্তরাষ্ট্র এ অভিযানে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে আমাদের পক্ষে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থও ব্যয় করা সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে আমরা কি এখনও শক্তি প্রয়োগের পথে সন্ত্রাসীদেরকে দমনের চেষ্টা চালিয়ে যাব, নাকি আমাদেরও উচিত বিকল্প পথের অনুসন্ধান করা?

বিকল্প পথ আছে কি?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পৃথিবীতে মোসলেম বলে পরিচিত ১৫০ কোটির যে জনসংখ্যাটি আছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আন্তরিকভাবে চায় যে তাদের জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠিত হোক। এসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এমনভাবে অনুপ্রাণিত (Motivated) ও সংকল্পবদ্ধ (Determined) যে তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে

দিয়েছেন। তারা কোনো পার্থিব স্বার্থে এ পথ বেছে নেন নি। তারা আল্লাহকে, আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসেন ও পরকালে বিশ্বাস করেন। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই তারা চূড়ান্ত সফল, এর বিনিময়ে তারা আখেরাতে জান্নাতে যেতে পারবেন। এজন্য তারা শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না, এবং এমন লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। প্রকৃত এসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা (আকিদা) ভুল ও বিকৃত হওয়ার কারণে তারা বুঝতে পারছেন না যে, তারা যে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করেছেন সেই পথে চললে তারা দুনিয়াও পাবেন না, আখেরাতও পাবেন না অর্থাৎ দুই কূলই হারাবেন। যতদিন তারা তাদের এই ভুল না বুঝতে পারবেন ততদিন শক্তি প্রয়োগ করে বড়জোর তাদের কার্যক্রমকে কিছু সময়ের জন্য স্তিমিত করা যেতে পারে, বন্ধ করা যাবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে ২০০২ সালে আমেরিকা যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করল মাত্র কিছুদিনের মধ্যে তালেবানরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল। আমেরিকা সেখানে তার অনুগত সরকার নিয়োগ দিল এবং দাবি করল, আফগান যুদ্ধে তালেবানরা চূর্ণ-বিচূর্ণ (Crushed) হয়ে গেছে, তারা আর দাঁড়াতে পারবে না। তাদের এ কথা বাকি বিশ্ব মেনে নিল। অথচ তার সাত বছর পর এসে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সেনাপ্রধান থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাই এখন বলছেন, আফগানিস্তানে তালেবানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তাই তারা সেখান থেকে চলে আসার পথ খুঁজছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উল্লিখিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাত বছর আপ্রাণ যুদ্ধ চালিয়ে আজ মহা পরাশক্তিগুলো কার্যত তাদের হার স্বীকার করে নিচ্ছে এবং সেখান থেকে চলে আসার পথ খুঁজছে। ২০০৩ সালে ইরাক জয় করার কিছুদিন পরই যুক্তরাষ্ট্রের বিগত প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইরাক যুদ্ধ শেষ। আজ ছয় বছর পরও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, প্রতিদিনই সেখানে গোলাগুলি, বোমাবাজি ও আত্মঘাতী বোমা হামলা চলছেই। এই ১২ এপ্রিলও সন্ত্রাসীদের হামলায় সেখানে পাঁচজন আমেরিকার সৈন্য নিহত হয়েছে।

তাহলে বোঝা গেল এ সন্ত্রাস নির্মূলের একটি মাত্র উপায় আছে, তা হলো- সন্ত্রাসীদেরকে যদি কোর'আন হাদিস থেকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তাদের পথটি এসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নয় এবং এ পথে জীবন দিয়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে না একমাত্র তাহলেই তারা সন্ত্রাসের এই পথ ত্যাগ করবেন। এর আর কোনো বিকল্প নেই। তারা যে ভুল পথে আছেন তা তাদেরকে বোঝানোর জন্য কোর'আন ও হাদিসভিত্তিক যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি আমাদের হাতে আছে। এগুলো তাদেরকে বোঝাতে পারলে আশা করা যায় তারা সন্ত্রাসী পথ ত্যাগ করবেন।

অতএব আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে...

আপনারা আপনাদের পছন্দনীয় কোনো স্থানে আপনাদের হাতে গ্রেফতারকৃত এসলামি সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর মধ্য থেকে আপনাদের পছন্দমত বাছাই করা ব্যক্তিগণকে একত্র করবেন। তারা কারা হবেন

এবং সংখ্যায় কতজন হবেন তা আপনারাই স্থির করবেন। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব আমাদের কাছে থাকা সকল যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে বোমা মেরে, গুলী করে মানুষ হত্যা করে দেশ ও সমাজের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে এসলাম বা শান্তি আনা যাবে না। আমাদের হাতে থাকা কোর'আন ও হাদিসভিত্তিক যুক্তিগুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে সবাই না হলেও তাদের অধিকাংশই সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে শান্তির ধর্ম এসলামের পথে আনার চেষ্টা করবে। আমরা যখন তাদেরকে বোঝাব তখন প্রয়োজন হলে আপনার প্রতিনিধিরা সেখানে থাকবেন, তারা শুনবেন আমরা সন্ত্রাসীদেরকে কী বলি, কী বুঝাই। সেখানে আপনাদের যতসংখ্যক ইচ্ছা নিরাপত্তাকর্মী রাখবেন। ইচ্ছা হলে আমাদের বক্তব্য রেকর্ড করবেন।

এই উদ্যোগে যদি কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসে তবে যারা এখনও গ্রেফতার হয় নি কিন্তু সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য যারা সন্ত্রাসী পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করছে, আমাদের কাছে থাকা তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণ প্রকাশ্যে প্রচার করলে তারাও অবশ্যই তাদের ভুল পথ পরিত্যাগ করে শান্তির পথে আসবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমার এ প্রস্তাবনা কোনো রাজনীতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। জাতির একটি অংশ আজ বিপথগামী হয়ে নিরীহ মানুষজনকে হত্যা করছে এবং নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। এটা আমায় ব্যথিত করে দিয়েছে বলেই আপনার কাছে আমার এই অকপট ও আন্তরিক নিবেদন। আমি আশা করছি, নিরীহ মানুষের প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমার এ প্রস্তাবনাটি আপনি বিবেচনা করে দেখবেন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায়।

ধন্যবাদান্তে,

(মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী)

প্রতিষ্ঠাতা ও এমাম: হেযবুত তওহীদ

প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত তথ্যের সূত্রসমূহঃ

১। বিবিসি ও এএফপি-র বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও The Daly Star ২৪ মার্চ, ২০০৯, পৃঃ ১০

২। ১৪ মার্চ, ২০০৯, ইন্টারনেট, www.paktribune.com

৩। Washington, February 18, 2009 (AP), The NewsHour (Internet)

৪। ANI, Islamabad থেকে The Daily Star, ২৫, মার্চ, ২০০৯।

৫। ০১/০৫/২০০৭, New York Times, Internet

৬। AFP, PTI, Peshawar এর বরাতে The Daily Star-March, 30, 2009

৭। Wickipedia, ২৩/৩/২০০৯.

৮। ইন্টারনেট, www.paktribune.com

৯। Internet- Iraq War Results & Statistics as of February 18, 2009

১০। তথ্যটি প্রদান করেছেন ব্রিটেনের পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের পুলিশপ্রধান ও ব্রিটেনের সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ কর্মকর্তা স্যার নরম্যান বেটিসন (ব্রিটেনের পত্রিকা Independent-এর বরাত দিয়ে আমাদের সময়, ২৯ মার্চ, ২০০৯ ইং)।

১১। ০১/০৫/২০০৭, New York Times, Internet

১২। ১৪ মার্চ, ২০০৯, ইন্টারনেট, www.paktribune.com

১৩। বিবিসি, The STAR, 3 April, 2009

আদর্শিক লড়াই কেন ও কীভাবে?

মাননীয় এমামুয্যামান এ প্রস্তাবনা পেশ করেছিলেন ২০০৯ সনে। তারপরে আরো বহু রণাঙ্গন তৈরি করা হয়েছে যেগুলোতে লক্ষ লক্ষ মোসলেম দাবিদারের রক্তধারা প্রবাহিত হয়েছে। যাদের অস্ত্র বিক্রি করা দরকার তারা অস্ত্র বিক্রি করছে। কিন্তু এটা এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সর্বোচ্চ বল প্রয়োগে বা সীমাহীন অর্থব্যয় করেও যে জঙ্গিবাদ দমন সম্ভব নয়। মাননীয় এমামুয্যামান তাঁর চিঠিতে প্রমাণ করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত জঙ্গিবাদবিরোধী যুদ্ধ ফলপ্রসূ হয় নি, বরং বিশ্বে গত এক দশকে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে, অর্থাৎ যুদ্ধের ফলে জঙ্গিবাদ বৃদ্ধি

পেয়েছে। ১৮-নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বিবিসিতে প্রকাশিত 'বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ সূচক-২০১৪' রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতের হার শতকরা ৬১ ভাগ বেড়ে গেছে, যা শক্তিপ্রয়োগে জঙ্গিবাদ দমনের ব্যর্থতার প্রমাণ বহন করে। রিপোর্টে বলা হয় গত বছর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সবমিলিয়ে ১০ হাজারের মতো সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে যাতে প্রাণ হারায় ১৮ হাজার মানুষ। এ সংখ্যা ২০১২ সালের চেয়ে ৪৪ ভাগ বেশি। জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট, আল কায়দা, বোকো হারাম এবং তালেবানরাই অধিকাংশ সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ সূচকের শীর্ষে রয়েছে ইরাক, অথচ ১০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে ইরাক জয়ের ঘোষণাও দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। 'ইন্সটিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস' (আইপি) কর্তৃক প্রকাশিত ওই রিপোর্টে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, 'বিশ্বে কেবল সন্ত্রাসের তীব্রতাই বাড়ে নি এর প্রসারও বৃদ্ধি পেয়েছে।' ২০১৩ সালে যে পাঁচটি দেশে সর্বাধিক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো হচ্ছে- ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া এবং সিরিয়া। শতকরা ৮০ ভাগ হামলার ঘটনাই ঘটেছে এ ক'টি দেশে। এটা প্রমাণ করে যে, যেখানে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বেশি শক্তিপ্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে সন্ত্রাসী হামলার পরিমাণ তত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা প্রমাণ করে যে, জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে আগে আদর্শিক লড়াইয়ের দ্বারা জঙ্গিবাদকে ভুল প্রমাণ করতে হবে। এতে জঙ্গিরা যুদ্ধের প্রেরণা হারিয়ে ফেলবে এবং তাদের রিক্রুটমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দ্বারা ধিকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হবে, তারা গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে মতবাদভিত্তিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলার জন্য গণপ্রতিরোধের কোনো বিকল্প নেই।

প্রাচীন চীনা সমরবিদ ও সেনানায়ক সান যু (Sun Tzu) বলেছিলেন, "To fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting অর্থাৎ "যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভ করাই চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব নয়, শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিনা যুদ্ধে তছনছ করে দেওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব। আদর্শিক লড়াই (The Battle of Ideas) হচ্ছে শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিনা যুদ্ধে তছনছ করে দেওয়ার একটি কার্যকরী পদ্ধতি।

আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শুধু মানবতার কল্যাণে আমাদের দেশকে (এবং মানবজাতিকে) জঙ্গিবাদের হুমকি থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাই। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, যে আদর্শে দীক্ষিত হয়ে মানুষ বুকে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী হয় সেই পদ্ধতিকে ভুল প্রমাণ করতে যে শক্তিশালী যুক্তি (Anti-logic), তথ্য ও প্রমাণ প্রয়োজন তা আছে কেবল হেযবুত তওহীদের কাছে। তাই জঙ্গিবাদ দমন এবং একেবারে নির্মূল করা হেযবুত তওহীদ ছাড়া সম্ভব নয়।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই চালাতে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো নির্ভর করছে আলেম শ্রেণিটির উপর। আমাদের দেশের সরকার এ ব্যাপারে নির্ভর করছেন মাদ্রাসা শিক্ষিত মসজিদের এমাম আর বিভিন্ন সরকারি ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের উপর।

কিন্তু জঙ্গিদেরকে আদর্শিক যুদ্ধে পরাজিত করার সামর্থ্য কি এই ধর্মজীবী আলেম শ্রেণির রয়েছে?

এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর হলো: নেই। বাংলাদেশে কেবল নয়, দেড় যুগ আগে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটার পর থেকেই আলেমদেরকে দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারণা (Campaign) চালানো হয়েছে। তারা ইতোমধ্যেই অসংখ্য বই লিখেছেন, ওয়াজ করেছেন, টিভি চ্যানেলে সেগুলো বছরের পর বছর প্রচারিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এই বাস্তবতা এখন স্বীকার করে নেওয়ার সময় এসেছে যে, এই আলেমদের কাছে এমন কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই যা দিয়ে তারা জঙ্গিবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেন।

সত্যিকার যুক্তি প্রমাণ না থাকা ছাড়াও তাদের দ্বারা জঙ্গিদমনে কার্যকরী কোনো ভূমিকা রাখা সম্ভব নয় কারণ মাদ্রাসা শিক্ষিত এই আলেম নামধারী শ্রেণিটি ধর্মকে তাদের জীবিকার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এসলামের কাজ করে পার্থিব সম্পদ ও সুখ-সুবিধা হাসিল করছেন যা আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে কঠোরভাবে হারাম করেছেন (সুরা বাকারা ১৭৪ সহ বহু আয়াত)। যে তাদেরকে টাকা দেয়, ভাড়াটে আলেমরা তার পক্ষেই কথা বলেন, সামান্য পার্থিব স্বার্থে তারা কোর'আন হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে মিথ্যা ফতোয়া প্রদান করেন। তাদের এসব ব্যাখ্যায় সত্য-মিথ্যার কোনো ভেদাভেদ থাকে না। হারাম ভক্ষণকারীর কোনো চরিত্র থাকে না, নৈতিক মেরুদণ্ড ও সত্যের প্রতি অবিচলতা থাকে না, অর্থের লোভে তারা যে কোনো মিথ্যার সঙ্গে আপস করে। তাদের এই স্বভাবের কারণে আমাদের সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা একেবারেই কমে গেছে।

তাছাড়া যামানার এমাম প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এই তথাকথিত আলেমরা প্রকৃত এসলামের অনুসারী নন। তাদের কাছে যে এসলামটি আছে সেটা একটি বিকৃত এবং বিপরীতমুখী এসলাম। যে কোনো জিনিস বিকৃত হয়ে গেলে সেটা বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি (Form) ধারণ করে। এই আলেম-পুরোহিত শ্রেণি হচ্ছে বিকৃত এসলামের একটি শাখা আর জঙ্গিবাদ হচ্ছে বিকৃত এসলামের আরেকটি শাখা। এই ধর্মজীবী আলেমদের কাছে সঠিক এসলাম থাকলে তারা নিজেরা যেমন ধর্মব্যবসা করতেন না, তেমনি এ সমাজে জঙ্গিবাদেরও জন্ম হতো না। জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছেন আরেক শ্রেণির আলেম। বিকৃত এসলামের অনুসারী ধর্মজীবী আলেমরা অন্ধ ও পথভ্রষ্ট, অপরপক্ষে জঙ্গিরাও অন্ধ ও পথভ্রষ্ট, যদিও উভয়ের মধ্যে আদর্শের ফারাক রয়েছে। একজন পথভ্রষ্ট অন্ধ কি কখনও আরেক পথভ্রষ্ট অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? পারে না। তাই ধর্মজীবী, প্রচলিত এসলামের আলেমদেরকে দিয়ে জঙ্গিবাদের মোকাবেলা করার চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এতে সময় ও সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই হবে না।

তাছাড়া আমরা জানি যে, মাদ্রাসা-শিক্ষিত শ্রেণিটি সহজেই জঙ্গিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং মাদ্রাসাশিক্ষিত অধিকাংশ ব্যক্তির মনেই 'জেহাদি'দের প্রতি একটি কোমল অনুভূতি (Soft corner) ও শ্রদ্ধামিশ্রিত সমর্থন থাকার যৌক্তিক কারণ রয়েছে, কারণ শত হলেও জঙ্গিরা এসলামের জন্য জীবন দিতে উদ্যত, তাদেরও অধিকাংশই মাদ্রাসাশিক্ষিত। তাই তথাকথিত আলেম বেশধারী ব্যক্তিদেরকে দিয়ে জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারণা চালানোর কোনো মানেই হয় না। তবে মাদ্রাসা থেকেই শুধু জঙ্গি তৈরি হয় তা নয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকেও জেহাদের অপব্যাখ্যা দ্বারা ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত সন্তানদের জঙ্গিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এ প্রবণতা কেবল গ্রেফতার, রিমান্ড, কারাদণ্ড, ফাঁসি দিয়ে রোধ করা সম্ভব নয়।

এটা উপলব্ধি করেই মাননীয় এমামুয্যামান এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যে আদর্শে দীক্ষিত হয়ে মানুষ নিজের জীবন-সম্পদ সব তুচ্ছ করে অনিশ্চিত জীবন বেছে নেয়, এমনকি বুকে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী হয়, এসলাম প্রতিষ্ঠার সেই পদ্ধতিকে ভুল প্রমাণ করতে যে শক্তিশালী যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ প্রয়োজন তা তাঁর কাছে আছে। তাঁকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবে তিনি কোর'আন ও হাদিসভিত্তিক সেই যুক্তি ও প্রমাণগুলো তুলে ধরে জঙ্গিদেরকে, এসলামের নামে সহিংসতা সৃষ্টিকারীদেরকে ভ্রান্তপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এনশা'আল্লাহ।

সন্ত্রাসবিরোধী আইন-২০০৯ এ সন্ত্রাসবাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী শুধু এসলামের নামে বোমাবাজিই কিন্তু জঙ্গিপনা, সন্ত্রাস বা Terrorism নয়, যে কোনো কারণেই হোক, যারা মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি বা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করল তারা হচ্ছে সন্ত্রাসী। এই হিসাবে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আদর্শের যে দলই হোক না কেন, কেউ যদি বোমা ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, মানুষ হত্যা করে সেটাও সন্ত্রাস। সর্বপ্রকার সন্ত্রাস থেকে আমরা মানবজাতিকে মুক্ত করতে চাই। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, যামানার এমামের শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে তারা সর্বরকমের ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, অন্যায়-অপরাধ থেকে নিজেরা যেমন হবে, তেমনি মানবজাতিকেও মুক্তি দিতে পারবে এনশা'আল্লাহ। তার একটি প্রমাণ হেযবুত তওহীদের গত ১৯ বছরের রেকর্ড। এই দীর্ঘ সময়ে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন এবং এর কোনো সদস্য একটিও আইনভঙ্গ করে নি, একটিও অপরাধ করে নি। এটা আমাদের দাবি নয়, এটা আদালতের রেকর্ড। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল এই কারণে যে, হেযবুত তওহীদ আল্লাহর প্রকৃত এসলামের অনুসরণ করছে।

আজ যখন রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল পদে আসীন ব্যক্তিগণ অনুভব করছেন যে তাদের আদর্শিক যুদ্ধে অন্যদেরও এগিয়ে আসা, অংশ নেওয়া প্রয়োজন তখন এমামুয্যামানের সেই প্রস্তাবনাটি বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করছি। আমরা আশা করব, সরকার যদি সত্যিই জঙ্গিবাদ সমস্যার সমাধান চান তবে আমাদের এই প্রস্তাবনাটি বিবেচনায় রাখবেন।

এখন করণীয়ঃ-

এটা প্রমাণিত সত্য যে, জঙ্গিবাদের স্রষ্টা তারাই যারা আজকে 'জঙ্গি জঙ্গি' বলে হৈ চৈ করছে, অর্থাৎ পশ্চিমারা। আর যারা ধর্মকে নিজেদের জীবিকার মাধ্যমে পরিণত করেছে সেই ধর্মব্যবসায়ীরাও জঙ্গিবাদের উস্কানিদাতা। এ বিষয়ে যেটুকু তথ্য-প্রমাণ দিলাম তা সামান্য হলেও আশা করি তা যেকোনো সত্যসন্ধানী মানুষের উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই জঙ্গিবাদ নির্মূল করার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? মোসলেম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়ক, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সুশীল সমাজ, জননেতা, বুদ্ধিজীবী সাধারণ জনতা সকলের প্রতি আমাদের কথা হলো, এই পরিস্থিতিতে অতি সাবধানে আমাদেরকে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করতে হবে। যথাঃ

(১) রাজনীতিতে ধর্ম এখন প্রধান ইস্যুঃ

যারা জাতির কর্ণধার অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমাদের উপমহাদেশের রাজনীতিতে বর্তমান সময়ে ধর্ম সবচেয়ে বড় ইস্যু, তাই মানুষের ধর্মানুভূতিকে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। ইউরোপে সেক্যুলারিজমের জয়জয়কার। তারা তাদের সেই ধ্যান-ধারণাকে সবার উপরে চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে ইউরোপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মানসিক গঠনও সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের মানুষের পক্ষে ধর্মহীন জীবনব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই ইউরোপ ছিল ধর্মবঞ্চিত। জনগণের অধিকাংশই ছিল মূর্তিপূজক প্যাগান। বর্বর রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে নিরুপায় প্রজার নিষ্পেষণই ছিল ইউরোপের জীবনব্যবস্থা। ঈসা (আ.) এর আনীত ধর্মের আংশিক পরিবর্তিত রূপটি যখন ইউরোপে প্রচারিত হলো, তখন জনগণ এটাকেই তাদের মুক্তির পথরূপে বরণ করে নিল। কিন্তু হায়! সেখানে তো সামষ্টিক জীবন পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই জনগণের মুক্তি মিলল না। জন্ম নিল ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি, তারা নিজেদের মুখের কথাকেই ধর্ম বলে জনগণের উপর চাপিয়ে দিল। তারা সৃষ্টি করল মধ্যযুগীয় বর্বরতা (Medieval barbarism) নামক মানব ইতিহাসের কালো অধ্যায়। মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের গবেষণার ফল হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল নতুন বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থা, যার দ্ব্যার্থাত্মক, বিভ্রান্তিকর ও চমকপ্রদ নাম ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)। এই মতবাদের চর্চায় ধর্ম কার্যত ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বন্দি হলো। এই ইউরোপীয় জাতিগুলো যখন দিগ্বিজয়ে বের হলো, তারা পৃথিবীর বহু সমৃদ্ধ ও অ-সমৃদ্ধ জাতিকে তাদের গোলামে পরিণত করে ফেলল। তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতি মোসলেমদের জন্য এই গোলামিতে অভিষিক্ত হওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শাস্তিবিশেষ। মোসলেম হিসাবে তাদের উপর আল্লাহ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যে তারা সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে শান্তিময় একটি জীবন উপহার দেবে। তাদের এই দায়িত্ব ত্যাগের পরিণাম কী ভয়াবহ সেটাও আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'হে

মো'মেনগণ! তোমরা যদি (সত্যদীন প্রতিষ্ঠার) অভিযানে বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে তোমাদের উপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেবেন (সুরা তওবা ৩৯)'। কিন্তু আল্লাহর রসুল বিদায় নেয়ার ৬০/৭০ বছর পরই তারা এ দায়িত্ব ত্যাগ করেছিল। যার পরিণামে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়াবহ শাস্তি হিসাবে মোসলেমরা ইউরোপীয়দের গোলামে পরিণত হয়েছিল। এ সময়ে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভূখণ্ড ছিল মোসলেম দাবিদার মোঘল রাজতন্ত্রের দ্বারা শাসিত ভারত উপমহাদেশ। যদিও এখানকার জীবনব্যবস্থা প্রকৃত এসলাম ছিল না, তবে এসলামের বহু বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মই শান্তির একমাত্র উৎস এ কথাটি ভারতবর্ষের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে জেনে এসেছে, দেখে এসেছে। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে ভারতে সনাতন শাস্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল যা মানুষকে পরম শান্তিতে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা দান করেছিল। এভাবেই এতদঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনায়, সংস্কৃতিতে, তাদের রক্তের কণিকায় ধর্ম এতটাই প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে; সুতরাং ইউরোপের ঐ ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত জীবনব্যবস্থা এখানে অচল। তবু যেহেতু ইংরেজরা তখন প্রভু, তারা চাইল প্রভুর ধর্মই হবে দাসের ধর্ম। এ লক্ষ্যে তারা আধুনিক শিক্ষার নামে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা এখানে চালু করল যার মাধ্যমে তারা এ জাতির মধ্যেও ধর্মবিদ্বেষের প্রসার ঘটাতে চাইল। তারা তাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্বারা এ জাতির মননে গেড়ে দিতে চাইল যে, ধর্ম হচ্ছে মিথ্যা, কূপমণ্ডূকতা, অন্ধকার, পশ্চাৎপদতা, বর্বরতা, সকল প্রকার উন্নতি-প্রগতির অন্তরায়, মুক্তচিন্তার প্রতিবন্ধক। স্বভাবতই তাদের এই ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে মানুষের মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করল। তারা বুঝল সভ্য, আধুনিক, বিশ্বমানের মানুষ হতে হলে ধর্মকে বিসর্জন দিতে হবে, নিদেনপক্ষে খ্রিষ্টান হতে হবে। ঔপনিবেশিকদের এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা তারা এদেশে একটি ধর্মবিদ্বেষী বস্তুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন শ্রেণি তৈরি করতে সক্ষম হল। ইউরোপীয় জাতিগুলো নিজেরা নিজেদের মধ্যে দু দুটি বিশ্বযুদ্ধ করে নিজেদের যথেষ্ট শক্তিক্ষয় করে ফেলল এবং বিপর্যস্ত হলো। ফলে নিজেদের পুনর্গঠন করে এই বিশাল বিশাল উপনিবেশগুলো আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া উপনিবেশগুলোর ভেতর থেকেও স্বাধীনতার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা এ উপনিবেশগুলো থেকে আর উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ আহরণ বাদ ছিল না। যেটুকু বাদ ছিল সেটুকুও পরবর্তীতে যেন শোষণ করা যায় সে পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য তারা যখন নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করল তখন এই জাতির সরকার বানিয়ে দিয়ে গেল তাদের প্রদত্ত 'আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ' শিক্ষায় শিক্ষিত সেই দাস মনোবৃত্তির অথচ উন্নাসিক শ্রেণিটি থেকে বাছাইকৃত,পরীক্ষিত সবচেয়ে বংশবদ ব্যক্তিবর্গকে। আজ আমাদের বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, আমলাশ্রেণিসহ রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রকদের একটা বড় অংশই মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও আদতে ধর্মবিদ্বেষী। ধর্ম তাদের অধিকাংশের কাছেই অপ্রয়োজনীয় বিধায় পরিত্যাজ্য, কারো নিছক সামাজিকতার অবলম্বন, অনেকের কাছে ঘৃণ্য। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সেটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

সেই ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর থেকে উপমহাদেশের রাজনীতিতে এই পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাদর্শ দাপটের সাথে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে বহু বছর, কিন্তু ডানপন্থী শক্তিকে সদা-সর্বদা সমীহ করেই তাকে শাসনক্ষমতায় থাকতে হয়েছে। ডানপন্থী-বামপন্থী নিয়ে একটি টানাপড়েন চিরকালই ছিল, তবে হিন্দু, মোসলেম অধ্যুষিত এই অঞ্চলে ইংরেজদের বহু সাধনার 'সেক্যুলারিজম' সম্প্রতি একেবারে হুমকির মুখে পড়ে গেছে। গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা ও তার ধারক এই ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণির রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতা, সীমাহীন দুর্নীতি ও অন্যায় তাদের থেকে মানুষকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। সবচেয়ে বড় আঘাতটা এসেছে ভারতের বিগত ১৬ তম লোকসভা নির্বাচনে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের সবচেয়ে বড় ভোটাভুটির এই যুদ্ধে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি, বিজেপি। দলের এই সাফল্যের পেছনে কংগ্রেসের বিগত ১০ বছর শাসনামলের ব্যর্থতা ও বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদির শাসনাধীন গুজরাটের দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়নসহ আরো কিছু ইস্যুকে চিহ্নিত করা হলেও সবচেয়ে বড় কারণ নিঃসন্দেহে মোদি ও তার দলের হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তি। তিনি যেভাবেই হোক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটকে নিজের পক্ষে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষক ও কথাশিল্পী আবুল হাসনাত বিজেপির এই অভূতপূর্ব বিজয় সম্পর্কে লিখেছেন, "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে শুরু করে বজরং পরিবার কী দুর্ধর্ষ প্রচারে, সংগ্রামে, আক্রমণাত্মক ভূমিকায় তথা হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িকতার তুঙ্গ-তরঙ্গে দলটিকে স্থাপন করায় যে শক্তি ও ভিত জনগণের মনে ঠাঁই করে নিয়েছে তা-ই মোদির বিজয়কে অভূতপূর্ব সাফল্যের গৌরবটিকা পরিয়েছে।" (দৈনিক যায়যায়দিন, বুধবার, মে ২৮, ২০১৪)। এ বিজয়কে ভারতের ইতিহাসের এক বিপদসঙ্কুল অধ্যায়ের সূচনা (most sinister period since independence) হিসেবে বর্ণনা করেছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ (Pankaj Mishra, The Guardian, Friday 16 May 2014). তাদের আশঙ্কা মোদির মডেল উন্নয়ন ব্যাহত হলে ধর্মান্ধ রাজনীতির খেলা খেলতে পারেন। এমনকি তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদকে উসকে দেয়ার কাজও করতে পারেন, যা দেশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে নিয়ে যাবে। আর যদি তিনি সফলভাবে রাষ্ট্রপরিচালনায় সক্ষম হন তবে দেশের সেক্যুলার রাজনীতিক দলগুলো স্বভাবতই অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যাবে। এমনই ইঙ্গিত দিয়ে ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদিপ নায়ার সম্প্রতি Whither Congress? শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন, "কোনো সন্দেহ নেই, মোদি ভারতের জাতীয় নেতায় পরিণত হচ্ছেন, আর বিজেপি জাতীয় দলে পরিণত হচ্ছে। এটা সত্য, মোদির হাতে ট্রাম্পকার্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, যার মূল সুর হচ্ছে সংকীর্ণতা (Parochialism)। সেক্যুলার শক্তিগুলো কোনো রকম গাঁইগুঁই না করেই আত্মসমর্পণ করছে (The secular forces are meekly surrendering.)।" ['Mainstream Weekly: October 24, 2014]।

দাদাভাই নওরোজি, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, জওহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ইন্দিরা গান্ধী থেকে রাজীব

গান্ধী পর্যন্ত উপমহাদেশের কিংবদন্তী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যে দলটির ইতিহাস জড়িয়ে আছে সেই ১২৯ বছরের গরীয়ান রাজনীতিক দল কংগ্রেসের পক্ষে ডানপন্থী মোদির এক আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সেক্যুলার দলগুলোর জন্য গাঢ় লাল সংকেত প্রদর্শন করে। আমাদের দেশেও গণতান্ত্রিকদের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি, ক্ষমতাবানদের খাই খাই ভাব ইত্যাদির কারণে আমজনতার কাছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি মোহনীয় শব্দগুলোর আবেদন প্রবল সঙ্কটে পড়েছে, পশ্চিমাদের শেখানো শ্লোগানগুলো দিন দিন ভিত্তিহীন হয়ে পড়ছে। এ সুযোগটিকে কাজে লাগাচ্ছে ধর্মব্যবসায়ী সেই শ্রেণিটি যারা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে রাজনীতি করে, তারা বহুদিন বাদে প্রতিপক্ষের দুর্বল সময়ে নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে নিতে চাইছে। এটা ইতিহাস যে, সাধারণ মানুষ কখনো এই সুযোগ সন্ধানীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পরক্ষণেই আবার আলিঙ্গন করে নিয়েছে। তবে সময়ের ব্যবধানে জনতার উপর সুযোগ সন্ধানী শ্রেণিটির প্রভাব বাড়ছে, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এমতাবস্থায় বৃহত্তর জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে তাচ্ছিল্য করলে কার্যত দাঙ্গা ও সংঘর্ষই বৃদ্ধি পাবে; শান্তি, সম্প্রীতি হ্রাস পাবে। কারণ হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহর প্রেরিত যে জীবনব্যবস্থাগুলো দ্বারা মানুষ শান্তি পেয়েছে - এটা মিথ্যা নয়, সেই স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসগুলো মানুষের হৃদয়ে বার বার নাড়া দেয়। তাছাড়া ধর্মের সঙ্গে পারলৌকিক অবিনশ্বর জীবনের শান্তি-অশান্তিও জড়িত। সর্বোপরি পাশ্চাত্য 'সভ্যতার' বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থাগুলো মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই মানুষ স্রষ্টার বিধানের দিকে ফিরে যেতে চায়। তাই মানুষের ঈমানের উপর আঘাত না হেনে বোঝাতে হবে যে, সমস্ত ফকিহরা একমত যে, আকিদা সহিহ না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই। আকিদা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণা। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ কী, এ বিষয়টি সম্পর্কে যদি মানুষের সঠিক আকিদা না থাকে, তাহলে এই কাজ করতে গিয়ে ভুল পথে পা বাড়ানো বিচিত্র কিছু নয়। কাজেই যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে চান, তারা যে এ বিষয়ে এসলামের প্রকৃত ধারণা বা আকিদা জানতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ধর্মের নামে ব্যবসা, জেহাদের নামে সন্ত্রাস, হেকমতের নামে প্রতারণা, একামতে দীনের নামে অপরাজনীতি, সুন্নাতের নামে দাড়ি-টুপি-মেসওয়াক, এবাদতের নামে আনুষ্ঠানিকতা, ধর্মের নামে কুসংস্কার, ঈমানের নামে অন্ধবিশ্বাস, শরিয়তের নামে ফতোয়াবাজি চলতেই থাকবে।

(২) দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিষয়ে কঠোর অবস্থানঃ

যারা জাতির কর্ণধার তাদেরকে অবশ্যই ন্যায়, সত্য, হকের পক্ষে দৃঢ়পদ থাকতে হবে। কারণ জাতির কর্ণধারগণ যদি অন্যায় করেন তখনই জঙ্গিবাদের মতো অন্যায়গুলোর বিস্তার ঘটে, সমাজের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মানুষের মধ্য থেকে অনেকেই সমাজ পরিবর্তনের জন্য ভুলপথে পা বাড়ায়। পশ্চিমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জাল মানুষকে ভোগবাদী, উচ্চাভিলাসী, অস্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও আত্মকেন্দ্রিক করে ফেলেছে। ভোগবাদীদের অভিধানে নৈতিকতা, মানবতা ও জাত্যবোধ শব্দগুলো

থাকে না। অর্থই তাদের পরমার্থ, ভোগবিলাসের জন্যই দেহধারণ। পাশ্চাত্যের সিস্টেম ও এই শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে আজ যে যত শিক্ষিত হচ্ছে সে তত স্বার্থপর, দুর্নীতিবাজ, তত বড় জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী শয়তানে পরিণত হচ্ছে। তাই জাতির কর্ণধারগণকে লক্ষ রাখতে হবে, নিজ দলের বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বা আমলাদের মধ্যে কেউ যেন কোনোরূপে অর্থের জন্য পশ্চিমাদের পুতুলে পরিণত হতে না পারে। ভুললে চলবে না যে, এই শ্রেণিটি অতীতে শত শতবার খ্যাতি-অর্থের লোভে জাতিকে বিক্রি করেছে। জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ এরা সবাই ছিলেন নবাবের আমলা, মীর জাফর আলী খান ছিলেন নবাবের অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পরম আপনজন । তাই যারাই অর্থ-খ্যাতি-আনুকূল্যের লোভে দেশের ক্ষতি করতে দু'বার চিন্তা করে না, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার পাশাপাশি জনসাধারণকেও সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। পূর্বেই বলেছি, বর্তমানে আমাদের দেশে (অন্যান্য মোসলেম দেশেও) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশদের তৈরি। তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে বিকৃত এসলাম শিক্ষা দেওয়া হয়। যতদিন এই বিকৃত এসলাম শিক্ষাদান চলবে ততদিন ধর্মব্যবসায়ী সৃষ্টি হবে, তারা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার করবে। এই বিকৃত এসলাম শিক্ষার পথ খোলা রেখে ফতোয়াবাজি, জঙ্গিবাদ, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি, ধর্মান্ধতা কস্মিনকালেও নির্মূল করা যাবে না। দুষ্টক্ষতকে ব্যান্ডেজ দিয়ে যতই ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, ভিতরে ভিতরে তা রক্তকে দূষিত করে দেয়।

শুধু জঙ্গিবাদ নয়, যে কোনো সামাজিক অপরাধ মোকাবেলায় (দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, যৌতুক, ধর্ষণ, পারিবারিক হত্যাকাণ্ড, চুরি, ছিনতাই প্রভৃতি) ধর্মহীন শুষ্ক উপদেশ উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতই অর্থহীন হবে। মানুষের আত্মিক পরিবর্তন না আসলে অপরাধ সংঘটন থেকে কেউ মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, আর মানুষের আত্মার উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম কেবল ধর্ম। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে যতই তত্ত্বকথা আর মানবতাবাদ প্রচার করা হোক না কেন, যতই সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করা হোক না কেন, তা দিয়ে জঙ্গিবাদ তো নয়ই, কোনো সামাজিক অপরাধও দূর সম্ভব নয়। মানুষ যেহেতু জন্মগতভাবে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, তাই ধর্মের শিক্ষাকেই কাজে লাগিয়ে একটি সুন্দর, সুশীল, দুর্নীতিমুক্ত, অপরাধহীন পবিত্র সমাজ গঠন করা সম্ভব। এ কথাটি আমাদের নয়, বিদগ্ধসমাজও এখন এ বিষয়টি অনুভব করছেন। এখন নীতিনির্ধারকদের অনুভব করার সময় এসেছে। এ বিষয়ে দু'একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিচ্ছি।

গত ২২ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রি. তারিখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে ধর্ম, শান্তি এবং আন্তর্জাতিক বিষয় কেন্দ্র এবং ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগের উদ্যোগে 'সেক্যুলারিজম অ্যান্ড ফেইথ ইন্সপায়ার্ড ডেভেলপমেন্ট: আন্ডারস্ট্যান্ডিং কনটেস্টেশন অ্যান্ড কোলাবরেশন' শিরোনামে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় বক্তারা বলেন, "সমাজের মধ্যে ধর্মের প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়েই উন্নয়নের চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে হবে। বিশ্বজুড়ে ধর্ম নিয়ে যে উত্তেজনা এবং মৌলবাদী তৎপরতা চলছে, তা বন্ধ করতেও ধর্মের নানা

দিক বুঝতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মকে বাদ দেওয়া বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি- এই দুই পথকেই সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে হবে।” ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকবৃন্দ ছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান, জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোসে ক্যাসানোভা ও ক্যাথরিন মার্শাল, ভারতের সেন্টার ফর স্টাডিস অব ডেভেলপিং সোসাইটির রাজীব ভাগার্ভা, ব্র্যাকের হিউম্যান রাইট অ্যান্ড লিগ্যাল এইড বিভাগের পরিচালক ফস্টিনা পেরেরা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক বিনায়ক সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। (প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০১৪)

এছাড়া ২২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. পিটার অ্যাইগেন একটি দেশের দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশীল সমাজ, দেশের গণমাধ্যম ও বিশ্বাসভিত্তিক সংগঠনের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "We feel that very often, even if the top of a country-- a president or prime minister -- is extremely strong and committed to fight corruption, they cannot do it alone. They need civil society, media and faith-based organizations to change the culture (of corruption)." অর্থাৎ “আমরা মনে করি, একটি দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়, একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী, তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাধর এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও এটা একা করা সম্ভব নয়। দুর্নীতির এই সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে চাইলে তাদের প্রয়োজন সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক সংগঠন।”

মানুষের জাতীয় জীবনের দিকনির্দেশনা দানে খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতার পরিণামে জন্ম হয় ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের। তারপর ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিকদের হাত ধরে ধর্মহীন জীবনব্যবস্থা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। কখনো আকারে ইঙ্গিতে কখনো বা সরাসরি ধর্মকে বর্জনের পক্ষে ইউরোপের সমাজচিন্তক, শিক্ষাবিদ, লেখক জ্ঞানীগুণী দার্শনিকেরা তাদের যুক্তি তুলে ধরতে থাকেন। ইউরোপীয় শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে বাস্তবজীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং আদ্যিকালের কুসংস্কার হিসাবে তুলে ধরা হতে থাকে। রাজনীতিকরা সমন্বিতভাবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তারা ধর্মের অংশগ্রহণ ছাড়াই একটি শান্তিপূর্ণ, বৈষম্যহীন, ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম। বেশকিছুদিন এ ধারণার ভিত্তিতে রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ, ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হলো। কিন্তু সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিণামে যে সীমাহীন আর্থিক বৈষম্য সমাজে সৃষ্টি হয় তার নিস্পেষণে সমাজের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের আত্মা ত্রাহিসুরে ক্রন্দন করতে লাগলো। তাদের জন্য মুক্তির গান গেয়ে এগিয়ে এলো কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র যার মূলসুর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ও শ্রেণিহীন সমাজ গঠন। মার্কসবাদ বিশ্বমানবের চিন্তার জগতে অবিস্মরণীয় আলোড়ন তুলতে ও সুদিনের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করল। ধর্মকে বাদ দিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা পরিচালনার ধারণা

সর্বত্র গৃহীত হয়ে গেল। এর বাইরে সকলকেই রক্ষণশীল (Conservative) বলে আখ্যা দেওয়া হলো। সমাজতন্ত্রের দুঃখজনক স্বপ্নভঙ্গ ও ব্যর্থতার দরুন আবার এলো পুঁজিবাদী বহুদলীয় গণতন্ত্রের জোয়ার। এ দুটি জীবনব্যবস্থাই মরিয়া হয়ে মানবজাতিকে আদর্শিকভাবে পর্যায়ক্রমে অজ্ঞেয়বাদ, নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দিতে চাইল। এ প্রচেষ্টা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল গত শতাব্দীজুড়ে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের সম্পর্ক, আত্মার সম্পর্ক, নীতি-নৈতিকতার সম্পর্ক। একে বাদ দিলে মানুষের আত্মাকে বাদ দিতে হয়, সেই সঙ্গে সঙ্কটে পড়ে মনুষ্যত্ব, নীতি-নৈতিকতা, মানবতার অনুভূতিগুলি। মানুষ আর দশটা প্রাণীর মত উদরসর্বস্ব নয়, তার আত্মা আছে। তার মানসিক অবস্থার উপর সমাজের শান্তি-অশান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। মানবসমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক মমত্ববোধ, দরিদ্রের প্রতি দয়া, গুরুজনকে শ্রদ্ধা, পরিজনকে প্রতিপালন, সততা, সমাজচিন্তার প্রয়োজন পড়ে যেগুলি পশুর সমাজে প্রয়োজন হয় না। এগুলো আছে সকল ধর্মবিশ্বাসগুলোর মধ্যে। আজও মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে অংশটুকু টিকে আছে তা ঐ ধর্মগুলোরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। যেহেতু সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি জীবনব্যবস্থা কেবল মানুষের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক জীবনের সমস্যা নিয়ে কাজ করে তাই মানবচরিত্রে মনুষ্যত্বের সৃষ্টি-বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়ে সৃষ্টি হয় বিরাট শূন্যতা। সমাজের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার পদ্ধতি (Way of thinking) হয়ে পড়ে আত্মাহীন ও জড়বাদী। সমাজ থেকেও হারিয়ে যায় মানবতা, প্রতিটি মানুষ হয়ে পড়ে বন্ধুহীন, সহায়হীন, একাকী। সে সর্বদা দারিদ্র্যের ভয়ে ভীত কারণ টাকাই তার বিপদের বন্ধু, মানুষ বন্ধু নয়। এটাই আজ আমাদের সমাজের চিত্র। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা যাকে আমরা সরল অর্থে ধর্ম বলে থাকি। ধর্ম মানুষকে বুঝতে শেখায় কোন কাজটি উচিত, কোনটা অনুচিত; সামষ্টিক স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিস্বার্থকে ছোট করে দেখার শিক্ষা মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার ও সংস্কার থেকেই পায়। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে যখনই অস্বীকার করা হয়, তখনই এর প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ঐ চারিত্রিক গুণাবলি বিলীন হতে বাধ্য হয়। মানুষে ক্রমেই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হতে হতে এক সময় পশুপর্যায়ে অধঃপতিত হয়, সমাজ অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতিতে সয়লাব হয়ে যায়। এমনই একটি অন্যায়, অবিচারপূর্ণ সমাজে আজ আমরা বসবাস করছি যাকে অনায়াসে পশুর সমাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চালাতে যখন আমরা প্রায় ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছি তখন সৌভাগ্যক্রমে কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি খুলছে। তারা সমাজের উন্নয়নের জন্য ধর্মের অনুশাসনের সহায়তাগ্রহণ ও ধর্মভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের প্রতি সমাজ-কাণ্ডারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দেওয়ার যে নীতি বিশ্বময় চলছে তার বিরুদ্ধে সমাজসচেতন ব্যক্তিদের এই মতপ্রকাশ একটি যুগান্তকারী ভাবনা হিসাবে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। আমরা যামানার এমামের অনুসারীরাও এ কথাটিই এতদিন ধরে বলে আসছি। আমরা 'যেনতেন প্রকারে উদ্দেশ্য হাসিলের'

মানসিকতা থেকে নয়, বাস্তবতার নিরীখে ও সত্যের স্বার্থে যে, ধর্মকে বাদ দিয়ে নয় বরং ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় মানুষকে শিক্ষিত করে তুলে সমাজ থেকে অন্যায়-অপরাধ, অশান্তি দূর করার প্রস্তাব করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে যেন কোনো ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি হাইজ্যাক করে ভুল খাতে প্রবাহিত করতে না পারে। প্রচলিত বিকৃত এসলাম দিয়ে অপরাধহীন, অবিচারহীন পবিত্র সমাজ গঠন করার চিন্তাও হাস্যকর। সেটা সম্ভব শুধু আল্লাহ-প্রেরিত অবিমিশ্র সত ধর্মাদর্শ দিয়ে; যা অনাবিল, অবিকৃত, স্বচ্ছ, হৃদয়গ্রাহী, প্রাকৃতিক, সকলের বোধগম্য; যা আলো-বাতাসের ন্যায় ধর্ম-বর্ণ, দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য অবারিত, উপযোগী, সহজ ও সরল; যা কোনো বিশেষ শ্রেণির কুক্ষিগত নয়। আল্লাহর দয়ায় সেই প্রকৃত ধর্মাদর্শ আমাদের কাছে আছে যার পুনঃপুনঃ উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে।

(৩) নিশ্চিত না হয়ে কাউকে জঙ্গি বলা যাবে নাঃ

'গোপন সংবাদের' ভিত্তিতে যাকে তাকে জঙ্গি বলে গ্রেফতার ও হয়রানি করা যাবে না। কারণ বহু নীতিভ্রষ্ট মানুষ আজকাল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নির্দোষ ব্যক্তির উপর 'জঙ্গি' অপবাদ আরোপকে মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। যেভাবে গত কয়েকবছরে আমাদের দেশসহ দুনিয়াজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জঙ্গিপনার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, নিরপেক্ষ তদন্ত করলে দেখা যাবে সেই গ্রেফতারকৃতদের সিংহভাগই ছিলেন নিরপরাধ। যেদিকে বৃষ্টি সেদিকেই ছাতা ধরতে অভ্যস্ত এমন অনেক অসাধু ব্যক্তি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো ও প্রশাসনিক বিভাগে চাকরি করছেন যারা ভাবেন যে, গ্রেপ্তারকৃতকে কোনোমতে জঙ্গি হিসাবে দেখাতে পারলেই চাকরির শ্রীবৃদ্ধি হবে। তারা বিচার প্রক্রিয়ার আগেই সাংবাদিক ডেকে গ্রেফতারকৃতের বুকে নেমপ্লেট সেঁটে, তার সামনে কিছু অবৈধ আলামত রেখে জঙ্গি সাজিয়ে অতঃপর বীরোচিত গাম্ভীর্যসহকারে অস্ত্রহাতে পাশে দাঁড়ান আর নীতিভ্রষ্ট কিছু সাংবাদিক ছবি তুলে পত্রিকায় দিয়ে দেন। নিত্যদিনের পত্রিকায় এ জাতীয় ছবি দেখে দেখে পাঠকবর্গের মনে স্থির প্রত্যয় জন্মে যে, দেশটা জঙ্গিতে ছেয়ে গেছে। আসলে হয়তো কিছুদিন পরেই ঐ গ্রেফতারকৃতরা আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে হাজতবাস থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, তখন কিন্তু আর ঐ সংবাদ পত্রিকায় আসে না। কিন্তু জঙ্গি লেবেল তাদের গায়ে আঠার মতো লেগে যায়, যা থেকে তারা সহজে মুক্তি পান না। অসাধু কর্মকর্তাদের এ জাতীয় অদূরদর্শী ও স্বার্থান্বেষী কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় উগ্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আমরা স্ট্রিং অপারেশনের নামে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি তরুণ নাফিসকে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে দেখেছি। নাফিসকে ঋইও কৌশল করে সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিয়েছিল কিন্তু আমাদের দেশের এ অঙ্গনের চিত্র আরো ভয়াবহ। সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কই নেই এমন নির্দোষ ব্যক্তিকেও জঙ্গি আখ্যা দিয়ে হাজতে পাঠাতে আমরা দেখেছি। ক্ষুদ্রস্বার্থে এ জাতীয় হীন কাজে যারা লিপ্ত হচ্ছেন তারা দেশ ও জাতির কী ক্ষতি করছেন সেটা একবার ভাবুন। মনে রাখবেন, পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোই একটি দেশে জঙ্গি ইস্যু সৃষ্টি করে, এরপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে দেশটি দখল করে নেয়। তাই রজ্জুকে সর্প প্রতিপন্ন করার রাষ্ট্রনীতি ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী, কেননা সাপ মারতে যখন লাঠি

নিয়ে তারা এগিয়ে আসবে, তখন কারো পিঠই রক্ষা পাবে না। দেশে অনেকগুলো শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তা ভালোভাবে তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। অন্যথায় নির্দোষ মানুষও রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের শিকার হয়ে অপরাধীতে পরিণত হতে পারে।

(৪) এসলামের নিরীখে জঙ্গিবাদের অবৈধতা প্রমাণঃ

জাতির কর্ণধারগণকে বুঝতে হবে, শুধু শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ দমন করা সম্ভব নয়, কারণ জঙ্গিরা ধর্ম বিশ্বাস থেকে এ পথে পা বাড়িয়েছে। যারা স্বার্থের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে তাদেরকে ধরে এনে দু'ঘা দিলে শুধরে যেতে পারে, কিন্তু যে জঙ্গি কর্মকাণ্ডকে জেহাদ অর্থাৎ এবাদত মনে করে করা হচ্ছে সেটা থেকে কাউকে শুধু জোর করে বিরত রাখা যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে শতভাগ। কোনো জঙ্গিকে ফাঁসিতে চড়ালে সেই ফাঁসির দড়ি বহু মানুষের হৃদয়ে শাহাদাতের বাসনাই জাগিয়ে তোলে। তাই যতদিন না জঙ্গিদের আদর্শের অসারতা ও ভ্রান্তিগুলো কোর'আন-হাদিস-ইতিহাস থেকে যুক্তি উপস্থাপন করে প্রমাণ না করা যাবে, ততদিন জঙ্গিদেরকে যতই নির্যাতন, নিপীড়ন এমনকি হত্যা করা হোক, লাভ নেই, তাদের হৃদয়ের আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। মেরে-কেটে হয়তো তাদেরকে কিছুদিনের জন্য দমিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে না, উল্টো স্থায়িত্ব (Immunity) লাভ করবে। অবদমিত জীবাণুর মতো উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সেটা কোনো না কোনো সময়ে আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইরাক ও আফগানিস্তান।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে শক্তিপ্রয়োগ কখন অপরিহার্য?

তবে হ্যাঁ, জঙ্গিবাদ নির্মূলে শক্তি প্রয়োগেরও দরকার আছে। কারণ যারা ধর্মব্যবসা এবং ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি করে তারা তাদের মিছিল, অবরোধ, হরতাল, জ্বালাও-পোড়াওসহ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে 'জেহাদ' বলে চালাতে চায়। অধিকাংশ মানুষও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের সৃষ্ট অরাজকতার বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হলে প্রচার করা হয় যে, 'আলেম সমাজের উপর হামলা' হয়েছে। ফলে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়। এসলামের প্রকৃত ধারণাগুলো জনসাধারণের সামনে সম্যকভাবে তুলে ধরতে পারলে তারাই জঙ্গিবাদকে প্রতিহত করবে। সরকারকে এ নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে না।

এটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, শুধু উপদেশ দিয়ে অপরাধ নির্মূল হয় না, দণ্ডেরও আবশ্যক হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষকে এসলামের প্রকৃত শিক্ষা (আকিদা), ঈমানের উদ্দেশ্য, জঙ্গিবাদের প্রকৃত

স্রষ্টা কারা, কেন তারা এটি সৃষ্টি করেছে, ঐ পথে পা বাড়ালে মানুষের কী ক্ষতি, জাতির কী ক্ষতি, ধর্মের কী ক্ষতি, জঙ্গিবাদ কেন এসলাম-পরিপন্থী ইত্যাদি বোঝানোর পরেও যদি নিতান্ত অপরাধমনস্ক কিছু লোক থেকে যায়, যারা জঙ্গিবাদ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, তখন তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তিপ্রয়োগের বিকল্প নেই। কিন্তু শক্তিপ্রয়োগের বিষয়টি আসছে পরে, আগে প্রয়োজন সর্বমহলে জেহাদ, যুদ্ধ সম্পর্কে প্রকৃত এসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে জঙ্গিবাদের ভ্রান্ততা প্রমাণ করে দেয়া।

এ কথা ভুললে চলবে না যে, বিশ্বের একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সর্বশক্তি নিয়োগ করেও আফগানিস্তানের যুদ্ধে পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারে নি। তাদের সৈন্যরা যতটা না জীবন দিয়েছে সম্মুখ যুদ্ধে তার চেয়ে বেশি দিয়েছে হতাশায় আত্মহত্যা করে। (সূত্রঃ 'দ্যা টেলিগ্রাফ' ১৪ জুলাই ২০১৩ঃ More British soldiers commit suicide than die in battle, figures suggest.) যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত রিপোর্টেও এ তথ্যই ফুটে উঠেছে। (সূত্রঃ দ্যা গার্ডিয়ান, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ঃ ÔUS military struggling to stop suicide epidemic among war veterans.' এই রিপোর্টগুলোতে দেখানো হয়েছে যুদ্ধরত সৈনিকরা তো আত্মহত্যা করছেই, এমনকি যুদ্ধফেরত সৈনিকরাও প্রতিদিন ২২ জনের বেশি আত্মহত্যা করছে; এ হিসাবে মাত্র এক বছরে মোট আত্মহত্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,০৩০ জন। কী ভয়াবহ! এ যেন আত্মহত্যার মহামারি! কিন্তু কোনো এসলামিস্ট জঙ্গি হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন একটি নজিরও দেখা যায় নি, এমনকি বাগরাম, আবু গারিব, গুয়ান্তানামো বে ইত্যাদি যমালয়তুল্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে বহুবিধ অত্যাধুনিক নির্যাতনের সরঞ্জাম দিয়ে বর্বর নির্যাতন, ইলেকট্রিক শক, পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা, হাড়গোড় ভেঙ্গে ফেলা, আগুনে দগ্ধ করা, নখ চোখ তুলে ফেলা, হিংস্র পশুর হাতে তুলে দেয়া, মল-মুত্র খাওয়ানো, গরম পানি শরীরে ঢালা, মাসের পর মাস ঘুমাতে না দিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন করে ফেলা, ইত্যাদি অবর্ণনীয় শারীরিক, মানসিক ও অকথ্য যৌন নির্যাতন সত্ত্বেও তারা কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেয় নি। কিন্তু যারা তাদেরকে এই নির্যাতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং নির্যাতন করছে তারাই অপরিসীম অপরাধবোধ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করছে। সুতরাং দমননীতিতে সফলতা আসবে না।

ইরাক যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ১৫ ডিসেম্বর ২০১১। কিন্তু বাস্তবে সেখানে জঙ্গিবাদ নির্মূল হয়েছিল না বলেই আবারও সেখানে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। যেখানে পাশ্চাত্য জাতিগুলো তাদের বিরাট আর্থিক ব্যয় স্বীকার করেও, অকল্পনীয় সামরিক শক্তি ব্যবহার করেও সফল হয় নি, সেখানে আমাদের মতো ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে শুধু শক্তি দিয়ে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যাবে না, এটা সাধারণ জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে এসলামের প্রকৃত জ্ঞান দান করেছেন। তিনি তাঁর 'জেহাদ কেতাল ও সন্ত্রাস' বইয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, জঙ্গিবাদ আল্লাহর হুকুম

এবং রসুলাল্লাহর আদর্শবিরোধী। তিনি বলেছেন যে, জঙ্গিবাদ এমন এক আত্মঘাতী পথভ্রষ্টতা যা এর অনুসারীদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই ধ্বংস করবে।

জঙ্গিদের দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়ই ব্যর্থ, কারণ...

প্রথমত, তারা বিকৃত এসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

তারা যেটাকে এসলাম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সেটা আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়, সেটা ঐ পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর তৈরি মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া বিকৃত এসলাম এবং ১৩০০ বছরের বহু ফেরকা-মাজহাবের প্রচারিত বিকৃত আকিদার যোগফলমাত্র। ওটা প্রতিষ্ঠা করলে শান্তি আসবে না, তাই তালেবান শাসনামলে আফগানিস্তানে শান্তি আসে নি, উল্টো মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তারা বোমা মেরে বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক মানুষের হৃদয়ে দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাদের পশ্চাৎপদতা ও কূপমণ্ডূকতা বিশ্ববাসীর চোখে এসলামকে আদিম, বর্বর ধর্ম হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। তারা এসলামের যে ক্ষতি করেছে কোটি কোটি এসলাম-বিদ্বেষীও তা করতে পারত না। সুতরাং যেটা এসলামই না, সেটার জন্য যারা জীবন দেবে তাদের আত্মদান ব্যর্থ আত্মদান।

উল্লেখ্য যে, শত শত বছর থেকেই আফগানদের জীবনধারণ আর সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল এসলাম ধর্ম। কিন্তু তারা কোনো কালেই ধর্মান্ধ ছিল না। আফগানিস্তানে বহু প্রাচীনকাল থেকেই কিছু হিন্দু, যোরেস্ট্রিয়ান ও ইহুদিও ছিল। এরা ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা নির্যাতিত হয় নি, অতীতে আন্তগোষ্ঠী সংঘর্ষ কখনোই ধর্মের বিভেদকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় নি। এতখানি ধর্মীয় উদার আফগান সমাজে হঠাৎ করে ধর্মীয় কট্টরবাদের দিকে ঝুঁকে যাবার কারণটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কারণ তালেবানদের সঙ্গে কট্টরবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারা দাড়ি রাখাকে বাধ্যতামূলক করেছিল, ফুটবল খেলা, পুরুষদের হাফপ্যান্ট পরাকে হারাম করেছিল, নারীশিক্ষা কার্যত বন্ধ করেছিল, তাদেরকে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত করেছিল, কঠোর পর্দাপ্রথার মাধ্যমে নারীর উপর অমানবিক পোশাকরীতি আরোপ করেছিল, ইন্টারনেট, টেলিভিশনও অনৈসলামিক বলে বন্ধ করেছিল। এসকল অন্ধত্বের পেছনে রয়েছে আফগানিস্তানে ঐ সময়ে CIA প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের প্রশিক্ষণের প্রভাব। হাশরের দিন সেই মোজাহেদরা তাদের সেই নেতাদেরকে অভিযোগ করবে তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য।

দ্বিতীয়ত, জঙ্গিদের জেহাদ ও কেতাল সম্পর্কে ধারণা ভুল হওয়ায় তাদের গৃহীত এসলাম প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ভুল।

জঙ্গিরা এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেটা আল্লাহর রসুলের কর্মসূচি নয়। এজন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। স্বভাবতই ব্যর্থতা পুরস্কারযোগ্য নয়, উপরন্তু তাদের কারণে এসলামের গায়ে যে কালিমালিপ্ত হচ্ছে সেটার জন্য ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না। যারা এই ভুল পথে পা বাড়িয়েছে এখন সময় তাদের সামনে সঠিক পথটি তুলে ধরা, তাতে তারা সংশোধিত হবে।

জঙ্গিবাদের উত্থানের পর থেকে এসলামবিদ্বেষী মানুষেরা জেহাদকে 'সন্ত্রাস' বলে চালিয়ে জেহাদের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তুলতে চান। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে আজ জনারণ্যে সত্য প্রতিষ্ঠার জেহাদ ও কেতালের সাথে সন্ত্রাসকে একীভূত করে ফেলা হয়েছে। অথচ এগুলো সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। জেহাদ মানে যেকোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, সর্বাত্মক সংগ্রাম করা; আর সন্ত্রাস হচ্ছে হিংসাত্মক কাজ করে, বোমা ফাটিয়ে, ধ্বংস করে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা। এই জেহাদ হতে পারে দুই প্রকার- এক) ব্যক্তিস্বার্থে, দুই) আল্লাহর পথে।

আল্লাহর পথে জেহাদ অর্থ নিজের স্বার্থ না ভেবে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানবতার মুক্তির জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটাই করেছেন সকল নবী-রসুল-অবতারগণ। মানুষের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম ব্যতিরেকে এসলামই অসম্পূর্ণ; কারণ ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে, মো'মেন হবার সংজ্ঞা, শর্তের মধ্যেই আল্লাহ এই জেহাদ অর্থাৎ সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অঙ্গীভূত করে রেখেছেন (কোর'আন, সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)।

বর্তমানে জেহাদ বলতেই যুদ্ধ বোঝানো হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। বই লিখে, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে, মুখে বলে বুঝিয়ে অর্থাৎ যে যেভাবে পারে অসত্য বিলোপ করে সত্য প্রতিস্থাপনের চেষ্টাই জেহাদ। পক্ষান্তরে কেতাল হচ্ছে সশস্ত্র যুদ্ধ, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ। এটা ব্যক্তির কাজ নয়, রাষ্ট্রের ব্যাপার। রাষ্ট্রে সেনাবাহিনী থাকতে পারে, পুলিশ থাকতে পারে, তাদের কাছে অস্ত্র থাকবে। রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তে তারা সেই অস্ত্র ব্যবহারও করবে, এটা বৈধ। কিন্তু ব্যক্তি বা দল অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না।

আল্লাহর রসুল মক্কায় থাকতে অস্ত্র হাতে নেন নি। মক্কায় তিনি একজন নাগরিক ছিলেন। তাই অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও অস্ত্র ধরেন নি। রসুলাল্লাহ যদি একবার বলতেন, কে আছ আবু জেহেলের জবান চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারো? কোনো সাহাবি কি বসে থাকতেন? কিন্তু রসুলাল্লাহ সেটা বলেন নি। এমনকি একবার এক মহিলা সাহাবিকে কাফেররা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল হত্যা করার উদ্দেশ্যে। ওমর (রা.) রসুলাল্লাহর কাছে উক্ত সাহাবিকে উদ্ধার করে আনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুলাল্লাহ অনুমতি দিলেন না, বললেন, 'ধৈর্য ধরো।' অর্থাৎ মক্কী জীবনে রসুলাল্লাহ আক্রমণের শিকার হয়েও, আত্মরক্ষার জন্যেও অস্ত্রের সংস্পর্শে গেলেন না।

মদিনার অধিকাংশ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রসুলাল্লাহকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিল। এরপর রসুলাল্লাহ রাষ্ট্রের অভিভাবক হলেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য

অন্যান্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের মতোই যা যা করণীয় তা করলেন, রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে সন্ধি, সনদ, যুদ্ধ (কেতাল) করেছেন সবই করেছেন। অর্থাৎ মক্কা থেকে হেজরত করে মদিনায় গিয়ে যেই তিনি রাষ্ট্র গঠন করলেন তখনই নীতি বদলে গেল। কারণ কোনো রাষ্ট্র কখনো ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না। তার প্রয়োজন হয় অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। সুতরাং এসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি গোষ্ঠি বা দলগতভাবে কোনো কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই, আছে শুধু আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইনসম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীকেই বে-আইনী, সন্ত্রাসী বলতে হবে। কোর'আন ও হাদিসে যে কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত। মক্কায় যেহেতু আল্লাহর রসুল অস্ত্র হাতে নেন নি, সেহেতু কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন অস্ত্র হাতে নিতে পারে না। যদি ব্যক্তি বা সংগঠন অস্ত্র হাতে নেয় সেটাই হবে সন্ত্রাস। যারা এটা করে তারা রসুলের সুন্নাহ বা আদর্শ থেকে সরে গেল। আমরা পত্রিকার মাধ্যমে সর্ব শ্রেণির মানুষের সামনে মাননীয় এমামুয্যামানের বক্তব্য তুলে ধরছি। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে নি, এবং কোনোদিন পারবেও না।

আমরা পত্রিকা, সভা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের সামনে ধর্মের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা বলছি, ধর্ম হচ্ছে কোনো পদার্থের অন্তর্নিহিত গুণ যা সে ধারণ করে। যেমন আগুনের ধর্ম হচ্ছে উত্তাপ সৃষ্টি করা ও তার সংস্পর্শে যা আসবে তাকে প্রজ্বলিত করা। পানির ধর্ম হচ্ছে সিক্ত করা। যদি আগুন না পোড়ায়, পানি না ভেজায় তাহলে এরা তাদের ধর্ম হারাল অর্থাৎ বিধর্মী হলো। একইভাবে মানুষের ধর্ম কি? মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ব। মানুষ যদি স্বার্থপর হয়, ন্যায় অন্যায়ের বোধ হারিয়ে ফেলে, অপরের প্রতি দয়া ও করুণার অনুভূতি হারায় তখন মানুষও তার ধর্ম হারায় এবং বিধর্মী হয়ে যায়। স্রষ্টার পক্ষ থেকে যুগে যুগে যত নবী-রসুল-অবতার এসেছেন তারা মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তারা যে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার উদ্দেশ্যও ছিল মানুষের কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তাবিধান। সুতরাং মানবতাই হচ্ছে স্রষ্টার প্রেরিত একমাত্র ধর্ম, মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত এবাদত।

আমরা আরো বলছি, সামাজিক অনাচার, অশান্তি দূর করার উপায় হচ্ছে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মানুষের মানসিক পরিবর্তন ঘটানো। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে হিংস্র প্রাণীর থেকে বাঁচার জন্য যেমন পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি আমাদের সমাজে আজ মানুষের হাত থেকে নিজের জীবন ও সম্পদকে বাঁচানোর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত পাহারা দিতে হয়। প্রতিটি দেশে বহু নামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনবরত এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনোরূপ অবনতি হলেই সরকারকে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দোষারোপ করা হয়। উপাসনালয়গুলোতে প্রতিটি ধর্মের মানুষ স্রষ্টার ব্যক্তিগত ও জাতীয় শান্তির জন্য প্রার্থনা করছে। কিন্তু কোনোভাবেই অন্যায় অশান্তি দূর করা যাচ্ছে না। এর কারণ, পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাবে প্রতিটি মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থবাদী। কোনো পথে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করা যাবে তা

নিয়েই সে ব্যতিব্যস্ত, নীতি-নৈতিকতা, সততা, অন্যের ক্ষতি হচ্ছে কিনা ইত্যাদি এখন তার কাছে গৌণ। শিশুর খাদ্যে বিষ মেশাতেও তার চিত্ত কম্পিত হচ্ছে না, হতদরিদ্রের কাছ থেকে ঘুষ নিতেও তার বাধছে না, সামান্য অর্থের বিনিময়ে চলছে মানুষ হত্যার মহোৎসব। এমন সমাজে কোটি কোটি পাহারাদার-পুলিশ-শান্তিরক্ষী বসিয়েও, হাজারো প্রকার দুর্নীতি দমন কমিশন তৈরি করেও শান্তি রক্ষা করা যাবে না। শান্তি প্রতিষ্ঠার একটাই পথ আছে, মানুষকে বোঝাতে হবে যে, পশুর মতো কেবল জন্ম বংশবিস্তার মৃত্যুবরণের চক্রে বাঁধা থাকলে তাকে মানুষ বলে না। মানবজন্মের সার্থকতা ভোগবিলাসে নয়, অর্থ উপার্জনে নয়, মানবজন্মের সার্থকতা মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে। নামাজ, রোযা, হজ্ব, পূজা, প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা মানুষের মূল এবাদত নয়। মানবজাতি যেন সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে এ লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত এবাদত। মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে মসজিদে মন্দিরে দান করলে সেই দান স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছে না, ধর্মব্যবসায়ীর পকেট পর্যন্তই তার গন্তব্য। এই শিক্ষা যদি মানুষ পায়, তবে মানুষ অন্যের সম্পদ হরণ করা দূরে থাক, তারা অন্যের সম্পদকে পাহারা দেবে। তখন আর পুলিশকে চৌকি বসিয়ে পাহারার আয়োজন করতে হবে না।

মানুষকে বুঝিয়ে সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত করার জন্য যে উপাদান প্রয়োজন সেগুলো আল্লাহর দয়ায় আমাদের কাছে আছে যা আমরা পত্র-পত্রিকা ও প্রামাণচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধ্যমত প্রচার করে যাচ্ছি। এ কাজে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ নেই, কোনো রাজনীতিক অভিপ্রায় নেই। তবে আমরা মনে করি এ কাজ আমাদের এবাদত, এটা করার জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন। মানুষকে ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে সুখী-সমৃদ্ধ করতে পারার মধ্যে আমাদের পরকালীন জান্নাত এবং মানবজনমের সার্থকতা নিহিত আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, এমামুয্যামানের কথাগুলো যদি সর্বসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছানো যায় তবে কোনো ধর্মব্যবসায়ী বা জঙ্গিবাদী আর সাধারণ মানুষকে দিয়ে এসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করাতে পারবে না। দেশকে, জাতিকে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য এটি একটি বিরাট সুযোগ। আমাদের আশা এই সুযোগ দৃষ্টিমানদের দৃষ্টি এড়াবে না।

ধর্মবিশ্বাস:এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান

এ পর্বে আমি কয়েকটি মৌলিক ও অকাট্য সত্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হচ্ছে,

১) বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ধর্মকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই কেননা বিশ্বরাজনীতিতে ধর্ম এখন প্রধান নিয়ামক (Prime factor), এক নম্বর বিচার্য বিষয় (First issue)। ধর্ম থেকেই সৃষ্ট জঙ্গিবাদ যা বর্তমানের মানবজাতির ক্যান্সার হিসাবে বিবেচিত, ভোটের রাজনীতিতে ডানপন্থী ও

রক্ষণশীল দলগুলোর প্রধান হাতিয়ারও সেই ধর্ম। পৃথিবীর বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পালে দমকা হাওয়া লেগেছে যা সেক্যুলার দলগুলোর জন্য প্রধান সংকট বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি বামপন্থীরা ইদানীং ধর্মব্যবসায়ীদেরকে সমীহ করতে ও নিজেদেরকে ধার্মিক প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের দেশেও 'ধর্ম-কর্ম-সমাজতন্ত্র' পেন্টাগানে মাঠ গরম করে ধর্মাশ্রয়ীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে দেখা গেছে।

২) পশ্চিমা বস্তুবাদী ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মকে একেবারে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করার যে চিন্তা ও চেষ্টা করা হয়ে থাকে সেটা বাস্তবমুখী নয়, কারণ পৃথিবীতে গুটিকয় নাস্তিক ছাড়া আর সকলেই স্রষ্টার অস্তিত্বে, কোনো না কোনো ধর্মে এবং পরকালীন জীবনে বিশ্বাস রাখে। তাদের এ বিশ্বাস হৃদয়ের গহীনে গ্রথিত হয়ে আছে, অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে যা প্রতিনিয়ত তাদের চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপে প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে ধর্মের প্রকৃত রূপ হারিয়ে যাওয়ায় বিকৃত ধর্মগুলো মানুষের জন্য শান্তিদায়ক নয়, উপরন্তু ধর্ম নিয়ে হাজারো অপকর্ম ও বিকৃতি প্রচলিত আছে বিধায় অনেক মানুষ তথাকথিত ধর্মীয় আচার-আচরণ ও পুরোহিত-আলেমদের ধ্যান−ধারণার প্রতি বিরক্ত, অনেকেই ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা হারিয়েছে কিন্তু নাস্তিক হয় নি। সুতরাং ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসিত করে রাখার চিন্তা করা ভুল। রাষ্ট্রের প্রথম উপাদান হচ্ছে মানুষ, সেই মানুষের চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসকে গুরুত্বহীন মনে করা বা একেবারে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র চালানোর পথ হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা যদি বিভিন্ন মতবাদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে আপাতত বাদ রেখে একটু বাস্তবতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, চলমান দুনিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে বড় বড় সমস্যাগুলো বিরাজ করছে সেগুলোর উৎপত্তি ধর্মকে কেন্দ্র করেই। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গে এখানে আসছি না, তবে সেখানেও যাবতীয় সংকটের প্রধান কারণ যে ধর্ম, একটু ভেবে দেখলে সকলেই তা বুঝতে সক্ষম হবেন। মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রিষ্ট ধর্ম মানুষের জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলোর সঠিক সমাধান দিতে পারছিল না, অথচ ধর্মযাজকগণ ছিলেন প্রবল ক্ষমতার অধিকারী। তখন রাজা আর চার্চের মধ্যে, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যে তুমুল সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণামে ধর্মই ইউরোপীয় মানুষের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনোভাবে সমন্বয় করতে না পেরে নিরুপায় রাষ্ট্রনায়কগণ ধর্মকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন, এরই পারিভাষিক নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। সাধারণ মানুষের ধর্মপ্রাণতা আর রাজনীতিকদের ধর্মহীন রাষ্ট্রের চিন্তাধারার বিপরীতমুখী এ যাত্রা আজও আমাদের জীবনে নিত্যনতুন সংঘাত আর সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটিয়ে যাচ্ছে। এটা এখন রাষ্ট্রনায়কদের বড় মাথা ব্যথার কারণ যে, ধর্মকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না, আবার ধর্মজীবীদের হাতে দেশকে তুলেও দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ নানাবিধ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন তা এদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি গেলে সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভয়াবহ রূপ নেবে, বিকৃত ধর্মের কারণে মানুষ অন্ধত্ব, পশ্চাৎপদতার গহীনে

নিমজ্জিত হবে। এক কথায় আরেকটি মোল্লাতান্ত্রিক তালেবানি রাষ্ট্র (Theocracy) কায়েম হবে যা সাধারণ মানুষের কাম্য নয়। আবার জনগণের উপরও এই ধর্মব্যবসায়ীদের রয়েছে ব্যাপক প্রভাব, জনগণই গণতান্ত্রিক দেশের ভোটার যাদের ভোটে সরকার গঠিত হয়। তাই জনমতকেও বিবচেনা করতে হয়। এসব মিলিয়ে মানবজাতিকে বহুল উচ্চারিত সেই প্রশ্নের সমাধান এখন করতে হবে আর তা হলো:

রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মকে নিয়ে কী করা হবে?

এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: যুগে যুগে ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে, তাই ধর্মকে মানুষের কল্যাণেই কাজে লাগাতে হবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, ধর্মকেও যদি আমরা একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব ঘুঁচে যাবে, ধর্ম ও রাষ্ট্র হাত ধরে পথ চলবে এবং স্বভাবতই মানবজাতির সকল অন্যায় অশান্তির সমাধান হয়ে যাবে।

কীভাবে সেটা সম্ভব তা এখন বের করতে হবে। এজন্য আসুন বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করি। সর্বপ্রথম পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, প্রচলিত ধর্মগুলোই মানুষের জীবনে অনেকাংশে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এর কারণ এগুলো শত-সহস্র বছর ধরে বিকৃত হতে হতে বর্তমানের রূপ ধারণ করেছে এবং সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় সেগুলোকে পুঁজি করে বিভিন্ন শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ীরা বিভিন্ন প্রকার ফায়দা হাসিল করছে। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত না হলে ধর্ম থেকে মানুষ আজও প্রভূত কল্যাণ লাভ করত। সামনে দু'একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করব। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে এক শ্রেণির ধর্মাশ্রয়ীর দ্বারা ধর্ম এখন মানুষের সামষ্টিক জীবনে কল্যাণের চেয়ে ধ্বংসই সাধন করছে বেশি। তাছাড়া বর্তমান জীবনব্যবস্থায় ধর্মকে যেভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তথাকথিত ভাব-গাম্ভীর্য আরোপ করে উপাসনা, পরলোকগত নেতাদের কবর জেয়ারত ও কোর'আন খানি, ঈদ, পূজা-পার্বনে বাণী দেওয়া, উপাসনালয় পরিদর্শন করা, হজ্ব-তাওয়াফ, চেহলাম, অনুষ্ঠানের শুরুতে তেলাওয়াত ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সেখান থেকে উঠে এসে মানবসমাজে কল্যাণকর ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ ধর্মের নেই। আর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের সঙ্গে কেবল আখেরাতের যোগাযোগ, পার্থিব জীবনের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, এভাবে ধর্মকে গুরুত্বহীন করে রাখা হলেও ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মকে অপব্যবহারকারী রাজনীতিকরা মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে যুগে যুগে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে এসেছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে কোটি কোটি মানুষ হত্যাকেও বৈধ করে ফেলা হয়েছে। এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধর্মের নামে গণহত্যা, গণধর্ষণ, সর্বস্বপহরণ করা হয়েছে। বহু জাতিই এমন নির্মমতার শিকার হয়েছে। ইহুদি জাতির কথা বলতে পারি। সেই ৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার বছর এই ইহুদী জাতির ইতিহাস কী? তাদের ইতিহাস হচ্ছে এই যে, ইউরোপের যে দেশেই

তারা আশ্রয় নিয়েছে, বসতি স্থাপন করেছে, সেই দেশের সমস্ত মানুষ তাদের অবজ্ঞা করেছে, ঘৃণা করেছে। অনেকে শুকরকে যেমন ঘৃণা করে- তেমনি ঘৃণা করেছে। শুধু ঘৃণা করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি। কারণে-অকারণে মাঝে মাঝেই ইউরোপের খ্রীস্টানরা দলবদ্ধ হয়ে ইহুদীদের বসতি আক্রমণ করে তাদের পুরুষদের হত্যা করে মেয়েদের বেঁধে নিয়ে গেছে, সম্পত্তি লুটপাট করে বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই কাজটা ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা প্রতিটি ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রে এতবার করেছে যে ইউরোপীয় ভাষায় একে বোঝাবার জন্য একটি নতুন শব্দেরই সৃষ্টি হয়েছে- Pogrom, যার আভিধানিক অর্থ হলো Organised Killing and Plunerd of a Community of People, বাংলায় "সুসংগঠিতভাবে সম্প্রদায় বিশেষকে হত্যা ও লুণ্ঠন।" দু'হাজার বছর ধরে ইহুদীদের উপর ঐ চড়মৎড়স চালাবার পর শেষ Pogrom চালালেন হিটলার। তিনি ইউরোপের ইহুদীদের উপর চরম অত্যাচার করলেন ও ছয় মিলিয়ন অর্থাৎ ৬০ লক্ষ ইহুদীদের হত্যা করালেন (যদিও এ সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে)। একইভাবে একসময় সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কোপানলে ছারখার হয়ে গিয়েছিল মহামতি বুদ্ধের অনুসারীরা, পোপ দ্বিতীয় আরবানের ফতোয়ায় ক্রুসেডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা, আবার ইউরোপের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে স্পেন থেকে মোসলেমদের নির্মূল করে আটশ' বছরের ইসলামি সভ্যতার নামগন্ধ মুছে ফেলেছিল, সম্প্রতি বসনিয়াতে গণহত্যার পাশাপাশি দুই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করে সার্ব খ্রিষ্টানরা জারজ সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করেছিল। একই জাতীয় Pogrom আজ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইসরাইল ও পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু ইরাকেই হত্যা করা হয়েছে ১০ লক্ষ মোসলেম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা-ই মনে হোক না কেন এ সমস্ত হামলার পেছনে মূল ইন্ধন যে ধর্ম এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এটা সম্ভব হয়েছে শুধু এজন্যই যে, ধর্ম খুব সংবেদনশীল একটি বিষয়, এ ব্যাপারে মানুষ খুবই অনুভূতিপ্রবণ। মানুষ তার হৃদয়ের গভীরে স্রষ্টা, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মপ্রবর্তকগণের প্রতি সযত্নে শ্রদ্ধা লালন করে। ধর্মের উপর আঘাত হানলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে হেন কর্ম নেই যা করতে পারে না। এই উত্তেজিত করার কাজটি খুব নিপুণভাবে করতে পারে ধর্মের ধ্বজাধারী, লেবাসধারী পুরোহিত-আলেম শ্রেণি। এটা চরম সত্য যে, ধর্ম থেকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে শুধুই ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা পার্থিব স্বার্থ ছাড়া ধর্মের কোনো কাজই করতে রাজি নন। কিন্তু সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মকে পরকালীন জীবনের পথ ও পাথেয় মনে করে, ধর্মের প্রতিটি কাজ তারা করে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে। ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে মানুষের এই নিঃস্বার্থ ধর্মপরায়ণতাকে ব্যবহার করে, মানুষের ঈমানকে ওয়াজ করে উত্তেজিত করে তোলে এবং সেই ধর্মীয় চেতনাকে ভুল পথে প্রবাহিত করে। কোটি কোটি ভোটার ভোটদানকালে তাদের ধর্মবিশ্বাস (ঈমান) দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষকে বলে যে, অমুক ব্যক্তি ইসলামের শত্রু, কাফের, তাকে হত্যা করলে সেটা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ হিসাবে গণ্য হবে। অথবা বলে যে, অমুক সরকার বা অমুক দল ধর্মদ্রোহী,

তাদেরকে মারলে জান্নাত নিশ্চিত, তাদের দ্বারা নিহত হলে শহিদ, বাঁচলে গাজি। মানুষ সরল বিশ্বাসে তাদের কথায় ভুল পথে পা বাড়ায় এবং হত্যাকাণ্ডসহ বিবিধ সহিংস ঘটনা ঘটায়। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে দিয়ে অধর্মের কাজ করানোর চেয়ে বড় পাপ ও প্রতারণা আর হতে পারে না। কারণ তাদের কথায় পবিত্র জেহাদ মনে করে আখেরাতে পুরস্কারের আশায় মানুষ ইসলাম-পরিপন্থী কাজগুলো করে। কিন্তু বাস্তবে সে উভয় জগতেই হয় চরম ক্ষতিগ্রস্ত। সে তার ইহকাল-পরকাল দুটোই হারাবে। আর যারা তাদের ঈমানকে হাইজ্যাক বা লুট করে এভাবে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করবে, হাশরের দিন আল্লাহর কাছে তাদেরও জবাব দিতে হবে, সঙ্গে আরো বহু মানুষের পাপের বোঝাও তাদেরকে বহন করতে হবে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল (সুরা বাকারা-১৭৫)।

কিন্তু সেটা তো আখেরাতের বিষয়, বর্তমানে এই ধর্মজাত ফেতনা থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী? এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের ধর্মবিশ্বাস (ঈমান)-কে সঠিক পথে পরিচালিত করা। আবারও বলছি, ধর্মকে বাদ দেওয়া যাবে না, অবজ্ঞাও করা যাবে না বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক পথে (To right direction) পরিচালিত করতে হবে। আমাদের দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানসহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেই কমবেশি ধর্মপ্রাণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের একটি বিরাট অংশকে ইতোমধ্যেই ধর্মব্যবসায়ীরা বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আন্তধর্মীয় ভুল বোঝাবুঝি ও বিদ্বেষভাব এত প্রবলভাবে আছে যা বিশেষ বিশেষ ঘটনায় প্রকট আকার ধারণ করে। ১৯৪৭ এর দেশভাগ ছিল ধর্মভিত্তিক, কারণ ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের ফলে হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা এতটাই নৃশংস রূপ ধারণ করেছিল যে, একটি ভূখণ্ডে বসবাস করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তারপরও দাঙ্গা নিয়মিতই চলমান ছিল। একাত্তরে তার চরম রূপ আমরা দেখেছি যে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি ও সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে। একাত্তরে যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাদের এ সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধান কারণই ছিল ধর্ম।

ধর্মীয় উন্মাদনা থেকেই জঙ্গিবাদের সূচনা হয়। জঙ্গিবাদ ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতির ভয়াবহ পরিণাম আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ দেখে আসছি, নিকট অতীতেও (২০১৩) দেখেছি। ভবিষ্যতে যেন আমাদের দেশে আবারও কোনো প্রকার ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি ধর্মের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি করে জননিরাপত্তা ও দেশকে হুমকির মুখে ফেলতে না পারে, তাই যত দ্রুত সম্ভব ধর্মের এই অপব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ করা উচিত। অতীতে দেখা গেছে- সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করেন নি, তারা ব্যাটন ও বুলেটের দ্বারা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন এমন মনোভাবই প্রদর্শন করেছেন। তারা ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্ররোচিত বৃহত্তর জনসংখ্যার ঈমানকে খাটো করে দেখেছেন, অবজ্ঞা করেছেন। ফল হয়েছে এই যে, ধর্মব্যবসায়ীরা দেশজুড়ে এমন অরাজক পরিস্থিতি, অচলাবস্থা ও গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যা বিশ্বময় সমালোচনার ঝড় তুলে দিয়েছে এবং এদেশের মানুষকে মৌলবাদী, উগ্রবাদী হিসাবে চিত্রিত করেছে, পাশাপাশি জনজীবনকে অসহনীয়

দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তাই এ ধারণা করা বিরাট বড় ভুল যে, সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত, কূপমণ্ডূক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মান্ধাতার আমলের বাসিন্দা। তাদের সেন্টিমেন্টকে খাটো করে দেখলে বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকেই যাবে। ধর্মীয় অনুভূতির চাবি আর কোনোভাবেই স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে রাখা যাবে না। রাখলে সিরিয়া, মিশর, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, তিউনেশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে যা হচ্ছে সেটা এখানেও হবে, আজ নয়তো কাল এবং এই আশঙ্কা থেকেই যাবে। কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে জুমার দিনে মসজিদগুলোতে পাহারা দিতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে- এ পরিস্থিতি ভুল গেলে চলবে না। কিন্তু মানুষের ঈমানকে সঠিকপথে পরিচালিত করা হলে তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিয়ে মসজিদের মুসুল্লিদের পাহারা দিতে হবে না, বরং মুসুল্লিরাই বিনে পয়সায় আত্মা থেকে দেশ ও দেশের সম্পদ পাহারা দেবে।

ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনা করা যাবে না। পশ্চিমা বস্তুবাদী ‘সভ্যতা’র শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে আমাদের সমাজেও তথাকথিত মুক্তমনা, শিক্ষিত ও উন্নাসিক একটি শ্রেণির প্রাদুর্ভাব হয়েছে যারা বলে থাকেন ধর্ম কুসংস্কার, ধর্ম প্রাচীন যুগের সমাজপতিদের তৈরি করা জুজুর ভয়, স্রষ্টা বলতে কেউ নেই, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম সবই মানুষের কল্পনা। তারা ধর্মের প্রভাবকে, ধর্মের গন্ধকেও মানবজীবন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চান। রাষ্ট্রপরিচালকগণও অনেক ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাদের কথা ও কাজের দ্বারা যখন মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে তখনই সমাজে দাঙ্গা ও গোলোযোগ সৃষ্টি হয়। আমাদেরকে এই বিষয়েও অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, এই তথাকথিত মুক্তমনারা যতই বলুন, বইয়ে আর বণ্ঢগে লেখালিখি করুন না কেন, মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, অধিকাংশ মানুষই এসব কথা শুনবে না। এ কথা বিগত কয়েক শতাব্দীতে শত শতবার প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্ভবের পাশাপাশি নাস্তিক্যবাদেরও উদ্বোধন ঘটে যা কম্যুনিজমের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাসা বাঁধতে সক্ষম হয়। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধর্মহীন, এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক যুগে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষকেই ধর্মের প্রতি সন্দিহান করে তোলা হয়েছে। আর রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে তো বহু আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে। বিগত শতাব্দীতে কম্যুনিস্ট শাসনাধীন এলাকাগুলোতে নাস্তিক্যবাদী দর্শনের যে রমরমা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে করে নাস্তিক্যবাদী চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়করা ধারণা করেছিলেন যে এবার বুঝি স্রষ্টার ধ্যান-ধারণাকে মানুষের মন-মগজ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা সম্ভব হবে। কিন্তু কার্যত সেটা সম্ভব হয় নি। কারণ,

ক) যিনি সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ সেই স্রষ্টার রূহ বা আত্মা প্রত্যেকের ভেতরে আছে। স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট রকম উপাদান প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেগুলো পবিত্র কোর’আনে আল্লাহ আয়াত, নিদর্শন বা মো’জেজা বলেছেন। এসব দেখার পরও মানুষ অন্ধের মতো নাস্তিকে পরিণত হবে না। আল্লাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো স্রষ্টার

অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো সম্মানের সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশ্লেষণ করছে। এগুলোর স্বর্গীয় বাণীসমূহ মানুষের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে মাথায় করে রাখছে, সন্তানকে যেমন যত্ন করা হয় সেভাবে যত্ন করছে। সুতরাং মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা অপ্রাকৃতিক, বাস্তবতাবর্জিত, নিতান্তই অর্বাচীন ও মূঢ়তাসুলভ পরিকল্পনা।

খ) অতীতে হাজার হাজার হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্ম। এই ইতিহাস মানুষের জানা আছে। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির শাসনামল এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও শান্তিময় নয়। ধর্মের শাসনে প্রাপ্ত সেই শান্তির স্মৃতি মানবজাতির মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই যুগের হাওয়া তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, তারা শান্তির আশায় বারবার ধর্মের পানেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শেষ যুগে (কলিযুগ, আখেরি যামানা, The Last hour), আবার ধর্মের শাসন বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ বৈরিতা থাকবে না, কোনো অবিচার, অন্যায় শোষণ থাকবে না, পৃথিবীটা জান্নাতের মত শান্তিময় (Kingdom of Heaven) হবে। এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ মানুষ ধর্মের উত্থানই কামনা করে। এটা তাদের ঈমানের অঙ্গ, এ বিশ্বাস মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

গ) শান্তির আশায় ধর্মের পানে ছুটে চলা মানুষকে ফেরাতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হবে ধর্মের বিকল্প এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন যা তাদেরকে সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে পারবে, একই সঙ্গে দেহ ও আত্মার প্রশান্তি বিধান করতে পারে। কিন্তু সেটা মানুষ আজ পর্যন্ত করতে পারে নি (এবং কোনো কালে পারবেও না)। সত্যি বলতে কি আজ অবধি মানুষ নিজের জন্য এমন কোনো জীবনব্যবস্থাই তৈরি করতে পারে নি যা তাদেরকে শান্তি দিতে পেরেছে। চেষ্টা কি করে নি? বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু সেসব মতবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেছে সবই মাকাল ফল। শান্তির শ্বেতকপোত গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কারো হাতেই ধরা দেয় নি। [ধরুন, যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তুমি কীভাবে মরতে চাও? গুলি খেয়ে না বিষ খেয়ে? বাঁচার কোনো পথ নেই, কেবল মরার জন্য দু'টো পথ। ঐ মানুষটিকে একটা না একটা পথ বেছে নিতেই হবে।] মানুষের আবিষ্কৃত জীবনব্যবস্থাগুলোকে যত সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকা হোক না কেন তা হচ্ছে মানবজাতির সামনে মৃত্যুর বিকল্প পথ। জীবনের পথ একটাই; আর সেটা হলো ধর্ম। বর্তমান স্রষ্টাবর্জিত জীবনদর্শন মানুষকে কেবল নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জীবন উপহার দিয়েছে। কাজেই মানুষ এখন জীবন রক্ষার আশায় ধর্মের দিকে যেতে চাইবে, কেননা তাদের বস্তুত শান্তি দরকার। মানুষকে ধর্মহীন করার যে চেষ্টা করা হয় সেটা কোনোদিন সফল হয় নি, হবেও না। এখন একটাই করণীয়, মানুষের ঈমানকে, ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক পথে চালিত করা। প্রথমেই কয়েকটি মৌলিক বিষয় মানুষকে জানাতে হবে যেমন- ধর্মের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ। ধর্মব্যবসা সকল ধর্মে নিষিদ্ধ। ধর্মকে ঢাল হিসাবে

ব্যবহার করে ধর্মব্যবসায়ীরা কীভাবে মানুষকে প্রতারিত করছে, কীভাবে মানুষের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কীভাবে তারা মিথ্যা ফতোয়াবাজি ও ধর্মের অপব্যাখ্যা দ্বারা সমাজে অন্যায়, অশান্তি, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার করছে আর নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে এসব বিষয় সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। এটা করতে পারলে তারা আর ভবিষ্যতে ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রণোদিত হবে না, উন্মাদিত হবে না, উত্তেজিত হবে না, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়াবে না। তবেই ধর্মব্যবসায়ীরা তাদের আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের অপব্যবহার থেকে বিরত হতে বাধ্য হবে। সমাজ ধর্মব্যবসার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। পাশাপাশি ধর্মের গায়ে লেগে থাকা অধর্মগুলোকে চিহ্নিত করে ধুয়ে ফেলে ধর্মকে নির্মল করতে হবে। ধর্মের সত্য ও সুন্দর রূপটিকে যদি মানুষের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে আলো ও অন্ধকার, সাদা ও কালো পৃথক হতে সময় লাগবে না।

অতঃপর মানুষের ঈমানকে নিষ্ক্রিয়ভাবে ফেলে রাখা চলবে না, তাকে ইতিবাচক পথে, ন্যায়ের পথে, মানবতার কল্যাণে, মানুষের মুক্তির জন্য, জাতীয় উন্নতি-প্রগতির কাজে লাগাতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। এটা সহজবোধ্য যে, কোনো একটি কাজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় করা যদি অসম্ভবও হয়ে দাঁড়ায়, আপামর জনতা যদি তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে সেটা করতে উদ্যোগী হয় তাহলে রাষ্ট্রের বিনা খরচে খুব সহজেই করা সম্ভব। ধরুন, সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রতিটি গ্রামে হতদরিদ্র, অক্ষম মানুষদের জন্য একটি করে পাকা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ৮৫ হাজার আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে সরকারকে বিরাট বাজেট বরাদ্দ করতে হবে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, বৈঠকের পর বৈঠক করতে হবে, বিদেশীদের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততে হবে, ট্যাক্স বাড়াতে হবে, টেন্ডার দিতে হবে, সেখানে দুর্নীতি হবে, টেন্ডারবাজদের মধ্যে মারামারি হবে। এক কথায় সরকারের উপর বিরাট একটা চাপের সৃষ্টি হবে। ফলে এ উদ্যোগ হয়তো আদৌ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। আর যদিও বা হয়, সেই ব্যয়িত অর্থের অতি ক্ষুদ্র অংশই বাড়িটির নির্মাণ কাজে ব্যয় হবে এবং সে বাড়ি কতটা টেকসই হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু এ কাজটিই অতি সহজে করে ফেলা সম্ভব হবে যদি মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। যদি প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দাদেরকে এটা বুঝানো যায় যে, আমরা সবাই আমাদের গ্রামের দুস্থ আশ্রয়হীন মানুষের থাকার জন্য ঘর তৈরি করে দিলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল আমাদের উপর খুশি হবেন। এ ঘরের বিনিময়ে আল্লাহ পরকালে আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন এবং তাঁর জান্নাতে আমাদের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেবেন। নিরাশ্রয় মানুষগুলো আমাদের জন্য দোয়া করবে। মানুষের কল্যাণে কাজ করাই আমাদের প্রকৃত এবাদত। মানুষকে অবশ্যই ধর্মের আলোকে এভাবেই ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। এখন যদি মানুষগুলো যার যে সামর্থ আছে তা নিয়ে এগিয়ে আসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এ কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহলে সরকারি আর্থিক সহায়তা ছাড়াই শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে এবং বিনা দুর্নীতি, বিনা টেন্ডারবাজিতে ৮৫ হাজার গ্রামে পাকা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়ে যাবে। শুধু কি তাই? এ কাজে মোসলেম-সনাতন-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই অংশ

নেবে, তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হবে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি। সকল ধর্মেই পরহিতব্রতের কথা, 'মানবতার কল্যাণই মুক্তির পথ'- এ কথা বলা আছে। তাই ধর্মকে উপাসনালয়ের অচলায়তন থেকে বের করে মানুষের কাজে লাগাতে হবে। এভাবেই ধর্মবিশ্বাস একদিকে যেমন পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলবে, পরকালকেও সাফল্যমণ্ডিত করবে। আজ আমরা পদ্মাসেতু নিয়ে চিন্তিত। অথচ ১৬ কোটি মানুষের জন্য কল্যাণকর এই সেতু নির্মাণকে সহজ করে দিতে পারে ধর্মের সঠিক ব্যবহার। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, ধর্মকে ব্যবহার করেই আজ অনেক জাতীয় সম্পদ, ব্রিজ, সেতু, রাস্তাঘাট, রেললাইন পর্যন্ত ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ধর্ম আজ জাতীয় উন্নতি অগ্রগতির পরিবর্তে ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে ধর্মের প্রতি মানুষের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কিংবা ধরুন বাংলাদেশে এক কোটি দরিদ্র মানুষ আছে যারা পরনির্ভরশীল, অনেকে ভিক্ষাজীবী। একজন মানুষের সারাদিনে খাবারের খরচ একশ টাকা ধরলে দৈনিক লাগবে একশ কোটি, মাসে লাগবে তিন হাজার কোটি। এত টাকা বছর জুড়ে যোগানো কি সরকারের সাধ্যের মধ্যে? না। কিন্তু বাকি পনের কোটি মানুষকে যদি বোঝানো হয়, এই মানুষগুলো তোমাদেরই দরিদ্র ভাই। প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে তুমি নামায, রোযা করলেও লাভ নেই, তুমি তো মোমেনই হতে পারবে না। সুতরাং বাঁচতে হলে ওদের খাওয়াও। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দিবেন। তোমাদের অর্থ-সম্পদ ধর্মব্যবসায়ীদের দিও না, দরিদ্র মানুষকে দাও। এয়ারকন্ডিশনযুক্ত টাইলসের মসজিদ বানানোর দরকার নেই, আল্লাহর রসুল খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া মসজিদে থেকে রাষ্ট্র চালিয়েছেন। ওই টাকা দিয়ে এই ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে খাওয়াও। এভাবে যদি চেষ্টা করা হয়, দেখা যাবে রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে থাকা ঐ এক কোটি মানুষের জন্য রাষ্ট্রকে কোনো চিন্তাই করতে হবে না। আজও হাজার হাজার এতিমখানায় লক্ষ লক্ষ শিশু বড় হচ্ছে মানুষের দানের টাকায়, ধর্মকে বাদ দিলে এই ব্যয় তখন সরকারকেই যোগাতে হবে। যদি এতিমখানায় দানকৃত অর্থে ধর্মব্যবসায়ীদের কালো থাবা না পড়ত তাহলে নিঃসন্দেহে অর্থ উপচে পড়ত। আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নানা কলা কৌশলে নাগরিকদের কাছ থেকে ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি আদায় করা হয়। কিন্তু এভাবে রাজস্ব আদায়ের চেয়ে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত দান অধিক কার্যকরী।

এভাবে একটা একটা করে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে পাঠকের বোঝার জন্য এ কটিই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

অনেকে মনে করতে পারেন, এই যে সবাইকে বলা হবে, এই কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবে এটা কি সত্য, নাকি মিথ্যা? এটা মিথ্যা নয়, অবশ্যই সত্য। সকল ধর্মে আমাদের এ কথার অবশ্যই স্বীকৃতি মিলবে যে, মানুষের কল্যাণে কাজ করাই ধর্ম। এর বিনিময়েই স্রষ্টা পরজীবনে মানুষকে উত্তম প্রতিদান দিবেন বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং মানুষের ঈমানকে নেয়ামত বা আশীর্বাদ হিসাবে ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনে, মানবতার কল্যাণে, জাতির উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে, তবেই মানবজীবনের সার্থকতা

আসবে। এটাই আমাদের কথা। ভারী ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় আবার এটম বোমাও বানানো যায়। এটম বোমা পৃথিবীর জন্য হুমকি কিন্তু বিদ্যুৎ আশীর্বাদ। তেমনি ঈমানকে ভুল পথে নিয়ে গেলে যেমন জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি সেই ঈমানকে সঠিকপথে প্রবাহিত করা গেলে আখেরাতের সাথে সাথে পৃথিবীকেও সুন্দর করা যাবে। যে ঈমান দুনিয়ার কাজে লাগবে না তা হাশরের দিনেও কাজে লাগবে না। এজন্য আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে মানুষকে দোয়া করতে শিখিয়েছেন যে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দিন"। এখানে আগে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করার কথা বলা হচ্ছে। যার দুনিয়া সুন্দর নয়, তার হাশরও সুন্দর হবে না কারণ আখেরাতের জীবন দুনিয়ার জীবনের প্রতিফলনমাত্র। অতীতে বারবার মানুষের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে। মানুষের ঈমান এমন একটি সম্পদ যেটাকে আমরা যদি সঠিক পথে ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে সেটা অবশ্যই বিপথে-কুপথে পরিচালিত হবে। সেটা থেমে থাকবে না। কারো না কারো দ্বারা সেটা প্রভাবিত হবেই। যুগে যুগে সেই কুপথে পরিচালিত করার কাজটিই করেছে উগ্রপন্থী, ধর্মব্যবসায়ীরা, ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতিকারীরা এবং স্বার্থবাদীরা। তারা কেউ মানুষকে সন্ত্রাসের পথে নিয়ে বলেছে- এখানে বোমা মারো। কেউ বলেছে আমাদের ভোট দাও। কেউ বলছে আমাদের টাকা দাও। এভাবে মানুষ তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে বিভিন্নভাবে ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ জায়গা-জমি বিক্রি করে মানুষের কল্যাণে ব্যয় না করে পরকালীন মুক্তির প্রত্যাশায় ধর্মব্যবসায়ীদের হাদিয়া বা নজরানা দিয়েছে। এভাবে বহু ধর্মব্যবসায়ী ধনকুবের বনে গেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ নিঃস্বার্থভাবে তাদের আনুগত্য করেছে কেবলই ধর্মকে ভালোবেসে। কিন্তু সে ভালোবাসা অপাত্রে পড়েছে, নিষ্ফল হয়েছে। এখন মানুষকে বোঝাতে হবে- মানবতার কল্যাণে কাজ করাই তোমার প্রকৃত এবাদত, এই এবাদতই আল্লাহর কাম্য, এটা করলেই জান্নাত সুনিশ্চিত। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রচলিত বিকৃত ইসলাম ও ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোস উন্মোচন করে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য যে আদর্শিক উপকরণ তথা কোর'আন হাদীস, ইতিহাস, দলিল ভিত্তিক যুক্তি প্রমাণ প্রয়োজন তা আল্লাহর করুণায় আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আমরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যে এ কাজটি করার চেষ্টাও করে যাচ্ছি।) কিন্তু এত বৃহৎ কাজ করার জন্য যে প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ প্রয়োজন তা কোনো ব্যক্তি বা দলের একার উদ্যোগে করা কোনোকালেও সম্ভব নয়। এটা সম্ভব কেবল রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে। কল্যাণ-রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসাবে সেটা করা সরকারের দায়িত্ব এবং এতে রাষ্ট্রেরই কল্যাণ। মানুষকে এ বিষয়গুলো যদি যথাযথভাবে বোঝানো যায় তাহলে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট আর রাষ্ট্রের জন্য হুমকি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। জাতির কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে ধর্মই হবে সুশীতল শান্তির আধার।

সাবধান! মাথার উপরে চক্কর দিচ্ছে চিল

কোনো সাইক্লোন বা টর্নেডো সৃষ্টি হওয়ার আগেই যেমন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এর পূর্বাভাষ প্রদান করতে পারেন, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীরাও সমাজের বিভিন্ন নিয়ামক বা ফ্যাক্টরগুলোকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে সামনে কোনো সঙ্কট থাকলে তার পূর্বাভাস দেন এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় নির্দেশ করেন। এর বহু উদাহরণ আমরা দেখে থাকি। যেমন প্রফেসর হান্টিংটন ১৯৯৩ সনে বলেছিলেন যে, আসছে সভ্যতার সংঘাত। তার সেই পূর্বাভাষ কিছুদিনের মধ্যেই বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে এবং আজও বিশ্বমানব সেই সভ্যতার সংঘাতের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করছে। একইভাবে আল্লাহ যাদেরকে বিশেষ জ্ঞান (Divine Knowledge) দিয়েছেন তারাও কোনো বিপদ আসন্ন হলে বুঝতে পারেন।

আমরা অর্থাৎ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারীরা এ জাতিকে সতর্ক করছি যে, আপনাদের সামনে ভয়াবহ বিপদ। এ থেকে বাঁচার জন্য এখনো সময় আছে, সচেষ্ট হোন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন বিপদের সম্ভাব্যতা আমরা কী করে বুঝলাম? এর উত্তর হচ্ছে- ক) বাহিরের পরিস্থিতি, খ) অভ্যন্তরীণ অবস্থা। যে দেশে নিজেদের মধ্যে বিভেদ, বিভক্তি, হানাহানি এক কথায় চরম অনৈক্য বিরাজ করে তখন এই সুযোগটাই গ্রহণ করে সুযোগসন্ধানী পরাশক্তিগুলো। এটা অতীতে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে, নতুন করে প্রমাণ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

একবার চোখ মেলে দেখুন ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, লিবিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়াসহ পশ্চিমা আগ্রাসনে ধূলিস্মাৎ হওয়া মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর দিকে। বর্তমানে দাজ্জাল অর্থাৎ পাশ্চাত্য বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হিসাবে এসলাম ধর্মকে অর্থাৎ ১৬০ কোটির এই মোসলেম নামক জনসংখ্যাকে সাব্যস্ত করেছে। যারাই নিজেদেরকে মোসলেম বলে পরিচয় দেয় তাদেরকেই একে একে সে ধ্বংস করে দেবে। কারণ পাশ্চাত্য বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জাল চায় পৃথিবীর সকল সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব, সকল মানুষের উপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব। আর এখানেই প্রকৃত এসলামের সঙ্গে দাজ্জালের সংঘাত। এসলামের ভিত্তিই হচ্ছে মানবজাতির একমাত্র প্রভু স্রষ্টা। তাই দাজ্জালের সামনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ এই এসলাম নামক ধর্মটি, যারা এর অনুসারী তারাই এখন দাজ্জালের শত্রু। বিশ্বের প্রায় পঞ্চান্নটি ভৌগোলিক রাষ্ট্র মোসলেম নিয়ন্ত্রিত, অন্যান্য দেশেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ এসলাম ধর্মের অনুসারী। বিশ্বের অধিকাংশ খনিজ সম্পদ বিশেষ করে তেলসম্পদ মোসলেম নিয়ন্ত্রিত দেশের অধিকারে আর এই তেল-গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানি ছাড়া সমগ্র বিশ্বই অচল। পশ্চিমা পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো চায় এগুলোর উপর প্রত্যক্ষ অধিকার। তাই মোসলেম দেশগুলোতে আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য তারা টুইন টাওয়ার হামলা, আরব বসন্ত, আফগানে তালেবান শাসন, ওঝ এর উত্থান ইত্যাদি বহু নাটক সফলভাবে মঞ্চায়ন করেছে। এরপর বিগত বছরগুলোতে অনুগত মিডিয়ার অপপ্রচারের দ্বারা দাজ্জাল এসলাম এবং সন্ত্রাস এ শব্দ দুটিকে সমার্থক (Synonymous) বানিয়ে দিয়েছে। এখন টেররিস্ট বলতে শতভাগ মানুষ জঙ্গিই বোঝে, মার্কসিস্ট-মাওয়িস্ট বা গণতান্ত্রিক সন্ত্রাসীদের বোঝে না। দাড়ি, টুপি,

লেবাসের উপরও আরোপ করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, কারণ এগুলোকে এসলামের চিহ্ন বলে মনে করা হয়। কথায় বলে, আপনা মাংসে হরিণা বৈরী, হরিণের শত্রুতার নিজের সুস্বাদু মাংস। তেমনি মোসলেম পরিচয়ই আজ তাদের বড় শত্রু। বাংলাদেশে পনেরো কোটির অধিক জনগোষ্ঠী মোসলেম পরিচয় ধারণকারী। সুতরাং তাদেরকে এই বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে হবে, চোখ বন্ধ করে রাখার উপায় নেই। অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকবে না। ইরাকে যেদিন বোমা হামলা শুরু হয় সেদিন সকালের সূর্য দেখে কি কেউ আঁচ করতে পেরেছিলেন যে পরবর্তী ঘটনাপঞ্জি কেমন হবে? দিনটা ছিল আর দশটা দিনের মতই। কিন্তু হঠাৎ করেই তারা এল। কয়েক বছর যুদ্ধ চলল (অবশ্য ব্যাঘ্র-মুষিকের লড়াইকে যদি যুদ্ধ বলা যায়), পড়ে থাকলো ১০ লক্ষ মানুষের লাশ, হাজার বছরের সমৃদ্ধ নগর-বন্দর, প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র পরিণত হলো ধ্বংসস্তূপে। একই অবস্থা গাদ্দাফির দেশ লিবিয়াতেও হয়েছে। আমাদের দেশের তলদেশেও আছে সেই তেল, কয়লা, গ্যাস এমনকি ইউরোনিয়ামের মতো শক্তিশালী জ্বালানি। আমাদের এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলাকেও তালেবান-শাসিত আফগানে রূপ দেওয়ার পূর্বাভাষ জানাতে ১৭ আগস্ট ২০০৫ তারিখে ৬৩টি জেলায় সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল জেএমবি। চীন সংলগ্ন এবং ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানও স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে পশ্চিমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমুদ্রসীমা আর বন্দরও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং- আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।

এটা হচ্ছে বাইরের দিক। আমাদের ভেতরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। এখানে বিরাজ করছে ভয়াবহ রাজনীতিক কোন্দল, পরমত-অসহিষ্ণুতা। জনতার ভোটে নির্বাচিত রাজনীতিক নেতাদের একটি মাত্র কাজ, প্রতিপক্ষকে যে কোনো প্রকারে ঘায়েল করা। এজন্য প্রতিপক্ষের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদেরকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করাকেই তারা কৃতিত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। তাদের চোখে মুখে একে অপরের প্রতি নগ্ন আক্রোশ, বিদ্বেষ, উপহাস, প্রতিহিংসা, ঘৃণা, জিঘাংসা যেন ফেটে পড়ছে। বছরের পর বছর চলে যায়, তাদেরকে আলোচনায় বসানো সম্ভব হয় না। যে দেশগুলোকে তারা তাদের রাজনীতিক অভিভাবক বলে মানেন, তাদের অনুরোধেও এই রাজনীতিকরা এক টেবিলে বসতে চান না, কারণ বসলে পরিস্থিতি হাতাহাতির দিকেও গড়াতে পারে। টিভিতে টকশো অনুষ্ঠানে এমন পরিস্থিতি আমরা প্রায়ই দেখি। জঙ্গিদের তৎপরতাও থেমে নেই। কট্টরপন্থী জঙ্গিদেরও অস্তিত্ব এদেশে রয়েছে, অতীতে যারা বেশকিছু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, সিরিজ বোমা হামলা, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি দ্বারা দেশবাসীকে ত্রাসিত করেছে। প্রায়শই বিদগ্ধজনেরা মিডিয়ার সামনে দাবি করে থাকেন যে, তারা জঙ্গিশাসনে সফলতা অর্জন করেছেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা তাদের উদ্দেশে সবিনয়ে বলতে চাই, তাদেরকে দুর্বল মনে করা চরম বোকামী। এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গের দীক্ষা যারা একবার নিয়েছে, তাদেরকে চিরকাল দমিয়ে রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তারা কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তাদের ধর্মীয় চেতনাকে সঠিক পথে, মানবতার কল্যাণে পরিচালিত করা ছাড়া এর কোনো সমাধান নেই। সেই বিরাট কাজ এখনও বাকি। দেশে অশান্তির

দাবানল জ্বালাতে ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকারীরা এবং বঞ্চিত ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকরা শুধু একটা ইস্যুর অপেক্ষায় আছে। তাদের একটা ইস্যু চাই। একটি ইস্যু পেলেই রক্তের নদী বইয়ে দিতে, নৃশংসতা-নির্মমতার সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। ভিতরে ভিতরে দেশটা যেন বারুদের পিঁপে হয়ে আছে। একটি স্ফুলিঙ্গ ঘটিয়ে দিতে পারে বিরাট বিস্ফোরণ।

বিবিধ কারণে বাংলাদেশ যে বিরাট ঝুঁকির মধ্যে আছে এ কথা আমরা পত্রিকা মারফত বহুদিন থেকেই বলে আসছি। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন আমাদের এ আশঙ্কাকেই সমর্থন করেছে। সংবাদটি বিবিসি বাংলা এবং দৈনিক প্রথম আলোর সূত্রে জানা গেল (১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রি.)। এতে বলা হয়, গত ১৮ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস (আইইপি) এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদের বড় ধরনের ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ। ভবিষ্যতে যে ১৩টি দেশে সন্ত্রাস বাড়তে পারে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। অথচ ২০১২ সালের প্রতিবেদনে ১৫৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩৯তম। বাংলাদেশকে এই তালিকায় রাখার কারণ হিসেবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নারীর রাজনৈতিক অধিকারের অভাব, দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এ জন্য দায়ী। লক্ষণীয় যে, ঝুঁকির কারণ হিসাবে অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলোর সঙ্গে রাজনীতিক দলগুলোর অনৈক্য ও তাদের সৃষ্ট অস্থিতিশীলতাও রয়েছে যা আমরা পূর্বেই আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে তখন যে পশুপ্রাণীগুলোর মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক তারাও একত্রে মিলেমিশে বসবাস করে। আমাদের সামনে যে সঙ্কট এবং সে বহুমুখী সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত জীবনযাপন করছি, এ থেকে উদ্ধার পেতে ঐ সাপ আর নেউলের মতো আমাদেরকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে। আপাতত সব বিভেদ ভুলে যেতে হবে। কীভাবে, কিসের ভিত্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি সেটা আমরা আপনাদেরকে বহুভাবে জানিয়ে যাচ্ছি। কে সেটা শুনবেন কে শুনবেন না সেটা তার ব্যাপার। আমরা শুধু এক সতর্ককারী মাত্র। আমাদের ভিতর এবং বাহিরের নাজুক পরিস্থিতি চেয়ে দেখুন এবং মূল্যায়ন করুন। এরপরও যদি ধর্ম, স্বার্থ আর রাজনীতিক মতবাদের দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেলতে না পারেন, তাহলে আমাদের এই সুন্দর সবুজ দেশটিও যে কোনো মুহূর্তে শ্মশানে পরিণত করে দেওয়া হবে না তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ঊর্ধ্বাকাশে চক্কর দিচ্ছে চিল, গাছের ডালে নিষ্পলক চেয়ে আছে শকুন। অতএব সাবধান!

এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এমন এক পরিবারের সন্তান যাঁদের কীর্তির সঙ্গে আবহমান বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এক সূত্রে গাঁথা। ১৪০০ বছর আগে যে উম্মতে মোহাম্মদী আরবভূমি থেকে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের রক্তধারা বইছে এমামুয্‌যামানের ধমনীতে। সুলতানী যুগে এমামুয্‌যামানের পূর্বপুরুষ পন্নী বা কররানি বংশীয়রা ছিলেন বৃহত্তর বঙ্গ তথা গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। ব্রিটিশ আমলেও টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ-বগুড়া অঞ্চলে এ ক্ষয়িষ্ণু রাজপরিবারের জমিদারি বজায় থাকে। প্রজাহিতৈষিতা এবং ধর্মপরায়ণতার জন্য তারা ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়, তদুপরি ব্রিটিশ শাসনের তাঁবেদারি না করে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

এমামুয্‌যামান ছিলেন আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলিয়ান এমন এক মহামানব যাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একটি মিথ্যা কথা বলার বা অপরাধ সংঘটনের দৃষ্টান্ত নেই। তাঁর পিতৃনিবাস টাঙ্গাইল করটিয়ার জমিদারবাড়ি। পিতা মোহাম্মদ মেহেদী আলী খান পন্নী, পিতামহ মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরি ছিলেন তাঁর মাতামহ। মাননীয় এমামুয্‌যামান ১৯২৫ সালের ১১ মার্চ, পবিত্র শবে বরাতের রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায়, দু'বছর তিনি সেখানে পড়াশুনা করেন। তারপর ভর্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে। এ স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। এই সবগুলি প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দানবীর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। এরপর তিনি ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। তাঁর খালার বাড়ি বগুড়ার নওয়াব প্যালেসে (বর্তমানে জাদুঘরে রূপান্তরিত) থেকে প্রথম বর্ষের পাঠ সমাপ্ত করেন, দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তাল। আন্দোলনের চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্‌যামান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি এ সংগ্রামের কিংবদন্তী নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌, অরবিন্দু ঘোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। তিনি যোগ দিয়েছিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকি প্রতিষ্ঠিত 'তেহরিক এ খাকসার' আন্দোলনে। তিনি একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগদান করেও খুব দ্রুত জ্যেষ্ঠ নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি তাঁর দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আল্লামা মাশরেকি কর্তৃক Special Assignment

এর জন্য 'সালার-এ-খাস হিন্দ' মনোনীত হন। দেশভাগের অল্পদিন পর তিনি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। সুযোগ পেলেই রায়ফেল হাতে বেরিয়ে পড়তেন শিকারে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন। বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ফুটবলার, মোটর সাইকেল স্টান্ট ও রায়ফেল শুটার। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

তাঁর খালু নওয়াবজাদা মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (বগুড়া) ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর চাচাতো ভাই মোহাম্মদ খুররম খান পন্নীও ছিলেন আইন পরিষদের সদস্য। সমসাময়িক আরো রাজনীতিকদের পীড়াপিড়িতে এক যুগ পরে এমামুয্যামান আবার রাজনীতির অঙ্গনে পদার্পণ করেন এবং ১৯৬৩ সনে টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের উপনির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেকেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানীকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের পক্ষে ভোট চাওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি বলেছিলেন, 'সেলিমের বিপক্ষে আমি কারো কাছে ভোট চাইতে পারব না, চাইলেও লাভ নেই, তাঁর বিপক্ষে কেউ জিততে পারবে না।' সত্যিই তিনি বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন।

এম.পি. থাকা অবস্থায় তিনি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল অ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি' কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদারক্ষা, নিঃস্বার্থ জনসেবা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণে আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হয়েও তিনি প্রবীণ রাজনীতিকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের আদমজীসহ বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভিন্ন স্থানে বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হয়। দাঙ্গায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছিল এবং অবাধে চলছিল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। মানুষের সরকারবিরোধী মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য এসময় আইয়ুব সরকার এই দাঙ্গাকে আরও উৎসাহিত করে। কিন্তু মাননীয় এমামুয্যামান এম.পি-হয়েও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে দাঙ্গাকবলিত এলাকাগুলোতে হিন্দু-মোসলেম সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছিল এমামুয্যামানের দৃপ্ত পদচারণা। তিনি ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন তিনি। জাতীয় কবি কাজী নজরুলও একই গুরুর নিকট গান শিখেছিলেন। কবি নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও সঙ্গীতের গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামান।

ছোটবেলায় যখন মাননীয় এমামুয্যামান মোসলেম জাতির ইতিহাস পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলোর অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন করছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অর্ধবিশ্বজয়ী শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। সেই পরশপাথর হচ্ছে প্রকৃত এসলাম। আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দী পর থেকে এই দীন বিকৃত হতে হতে ১৩'শ বছর পর এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বর্তমানে প্রচলিত এসলাম রসুলাল্লাহর আনীত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি দীনের ভিত্তি তওহীদ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি বই লিখে এ মহাসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯৯৫ সনে তিনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন। যেদিন তিনি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিনই আল্লাহ তাঁকে রসুলাল্লাহর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস থেকে পৃথিবীতে সত্যভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঠিক কর্মসূচির জ্ঞান দান করেন। হেযবুত তওহীদ সেই কর্মসূচি মোতাবেক মানুষকে প্রকৃত এসলামের দিকে আহ্বান করতে আরম্ভ করে। তাঁর লেখা "দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!" বইটি সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এটি ছিল ২০০৮ সনের বেস্ট সেলার। তিনি প্রকাশ করলেন ব্রিটিশরা কীভাবে আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ১৪৬ বছর ধরে নিজেদের তৈরি করা বিকৃত এসলাম এ জাতিকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কীভাবে এ জাতিকে মনে মগজে পাশ্চাত্যের দাসে পরিণত করেছে। তিনি কোর'আন হাদীস থেকে প্রমাণ দিলেন যে, ধর্মব্যবসা অর্থাৎ এসলামের কাজ করে স্বার্থ হাসিল করা, অর্থ উপার্জন করা সম্পূর্ণ হারাম। এই

বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেওয়ায় ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লারা এমামুয্যামানকে কাফের, মুরতাদ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি বলে ফতোয়া দিতে লাগল। দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে নির্মম নির্যাতন ও প্রবল বাধার মুখে পড়তে হলো। ধর্মব্যবসায়ীরা বহু সদস্যের বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিল, বহুজনকে পূর্বপুরুষের ভিটা থেকে উৎখাত করে দিল, বহুজনকে পিটিয়ে আহত করল এমনকি একজন পুরুষ ও একজন নারী সদস্যকে শহীদ করে ফেলল। তবু হেযবুত তওহীদ এমামুয্যামানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সত্য প্রকাশে পিছপা হলো না। এরই মধ্যে অপপ্রচারে নতুন মাত্রা যোগ হলো বিশ্ব অঙ্গনে জঙ্গিবাদের আবির্ভাবের কারণে। এসলাম বিদ্বেষী কিছু গণমাধ্যম সঠিকভাবে না জেনে নিছক অনুমানের বশে, কেউবা জানার পরও হেযবুত তওহীদকে জঙ্গি, নিষিদ্ধ ইত্যাদি বলে অপপ্রচার করতে থাকে। যার ফলে হেযবুত তওহীদ চূড়ান্ত প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হয়। কিন্তু কোনো বাধাই হেযবুত তওহীদের পথরোধ করতে পারে নি। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠালগ্নেই এমামুয্যামান নীতি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে,

(১) এ আন্দোলনের কোনো সদস্য এসলামের কোনো কাজ করে কোনো পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না।

(২) কেউ অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যেতে পারবে না।

(৩) হেযবুত তওহীদ কোনো রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে না।

(৪) হেযবুত তওহীদের কেউ কোনোরূপ আইনভঙ্গ করতে পারবে না।

এ নীতিগুলো হেযবুত তওহীদের সদস্যরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছেন। হেযবুত তওহীদের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে ২০০৮ সনের ২ ফেব্রুয়ারি। এ দিন আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে সত্যায়ন করার জন্য ১৪০০ বছর পরে আবার মো'জেজা সংঘটন করেন।

২০১২ সনের ১৬ জানুয়ারি এ মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁর পরে হেযবুত তওহীদের এমামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এমামুয্যামানের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও আন্দোলনের সমন্বয়কারী জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। তিনি এমামুয্যামানের রেখে যাওয়া নীতি আদর্শ অনুসারে হেযবুত তওহীদকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।